আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি
বাড়ি ৭২, রোড ১৮, ব্লক জে
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
টেলিফোন : + ৮৮ ০২ ৮৮৩৭৪৬১, ৮৮৩৫৫১৫
ফ্যাক্স : + ৮৮ ০২ ৮৮৩৭৪৬২
ই-মেইল : dhaka@icrc.org
ওয়েব : www.icrc.org/bd

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
আইন ও শরিয়াহ্ অনুষদ
কুষ্টিয়া, ঝিনাইদাহ্
বাংলাদেশ
www.iu.ac.bd

০১২৫/২৫৬ ১১.২০১৪ ১০০০

ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন

ICRC

ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ICRC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ইসলাম
ও
আন্তর্জাতিক
মানবিক আইন

ভাষান্তর

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. মো: শাহজাহান মন্ডল

মোহাম্মদ আনোয়ারুল ওহাব



সুচিপত্র

- আইসিআরসি এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন ৫
- আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূল বিষয়সমূহ ৭
- কুরআন কারীম ও জেনেভা কনভেনশনের আলোকে মানব মর্যাদা ১০
  – মুহাম্মদ এরেকসূসী
- ইসলামী শরী'য়তে যুদ্ধে আক্রান্ত বেসামরিক জনগনের রক্ষাকরণ ও ইসলামে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ২৮
  – প্রফেসর ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলী
- ইমাম আওযা'য়ী র. এবং তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ৬০
  – ড. আমের আয-যামালী
- ইসলাম এবং যুদ্ধবিষয়ক কার্যকলাপের প্রক্রিয়াগত কিছু মূলনীতি : প্রেক্ষিত আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ৭৪
  – ড. আমের আয-যামালী
- ইসলামী আইন ও মানবরচিত আইনে বেসামরিক নাগরিকদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ৮৬
  – ড. মুনির আত-তালাইলী



আইসিআরসি এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি) একটি পক্ষপাতহীন, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন সংস্থা যার বিশেষ মানবিক লক্ষ্য হলো সশস্ত্র-সংঘাত ও অন্যান্য সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের জীবন ও আত্মমর্যাদা রক্ষা এবং তাদেরকে সহায়তা প্রদান করা। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (আইএইচএল) ও সর্বজনীন মানবিক নীতিমালাগুলোর প্রচার ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আইসিআরসি মানুষের ভোগান্তি প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে।

সুইজারল্যান্ডের নাগরিক হেনরী ডুনান্টের উদ্যোগে ১৮৬৩ সনে আইসিআরসি স্থাপিত হয় এবং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। এই আন্দোলনের অন্যান্য সহযোগীরা হলো ১৮৮টি দেশের জাতীয় সংস্থাসমূহ এবং তাদের আন্তর্জাতিক সংঘ আইএফআরসি, যা ফেডারেশন নামেও পরিচিত। রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সংগঠন ৭টি মূলনীতি যথাঃ মানবতা, নিরপেক্ষতা, পক্ষপাতহীনতা, স্বাধীনতা, সর্বজনীনতা, স্বেচ্ছাসেবা এবং একতা মেনে যুদ্ধ, সহিংসতা এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে সেবা দিয়ে থাকে।

১৯৭১ সনের যুদ্ধকালীন সময়ে আইসিআরসি প্রথম বাংলাদেশে আসে। সে সময় প্রায় ৭ লক্ষ বাস্তুচ্যুত জনগণকে সুরক্ষা ও সহায়তা প্রদান করে আইসিআরসি সহ রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের সহযোগী সংগঠনগুলো। এর মধ্যে অস্থায়ী বাসস্থান, খাদ্য, ওষুধ এবং পারিবারিক যোগাযোগ পুনঃস্থাপন ছিল প্রধান সেবা। যুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সন পর্যন্ত আইসিআরসি ১,১৮,০৭০ জন বাঙ্গালীকে পাকিস্তান থেকে স্বদেশে প্রত্যাবাসনে সহায়তা করে।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (তৎকালীন রেড ক্রস) গঠিত হয় ১৯৭৩ সনে। সরকারের সহযোগী (অক্সিলারী) সংগঠন হলেও, অন্যান্য জাতীয় সংস্থার মত এটি একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। যেকোন মানব-সৃষ্ট বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আইসিআরসি এবং আইএফআরসি-এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে সেবা প্রদান করে থাকে।

আইসিআরসি এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি যৌথভাবে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গুলো পরিচালনা করে :

- সাম্প্রদায়িক অথবা রাজনৈতিক সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রান বিতরণ;
- বিদেশের কারাগারে আটক বাংলাদেশীদের তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বার্তা বিনিময়, এবং বিশেষ ক্ষেত্রে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে সহায়তা;
- পুলিশ, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটলিয়ন, ফায়ার সার্ভিস, বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম এবং সেনাবাহিনীর মত জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া প্রদানকারী (ফার্স্ট রেসপন্ডার) সংগঠনগুলোর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে তাদের সদস্যদের জন্য ফার্স্ট এইড এবং মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন।

এছাড়াও, সুবিধাবঞ্চিত শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আইসিআরসি সাভারে অবস্থিত সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন অফ দ্য প্যারালাইজড (সিআরপি)-এর সাথে একটি প্রকল্প পরিচালনা করছে। এই কার্যক্রমের আওতায় দুঃস্থ ও অসহায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুলভ এবং উন্নতমানের কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (অর্থসিস এবং প্রসথেসিস) প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস) ২০১৪-এর মাঝামাঝি থেকে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি'র (আইসিআরসি) সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহের জীবন ও জীবিকা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি কমিউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রম শুরু করে। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো যেন এই ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলো আইসিআরসি এবং বিডিআরসিএস থেকে পাওয়া আর্থিক অনুদান কাজে লাগিয়ে কৃষি, পশুসম্পদ এবং ছোট ব্যবসা-উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে। পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু এলাকায় পানি, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সহায়তা দিয়ে আসছে, কারণ বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদার অবর্তমানে অনেক কমিউনিটিতে স্বাস্থ্যে ও জীবিকা নির্বাহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ২০০৬ থেকে আইসিআরসি, বাংলাদেশ সরকার, সামরিক বাহিনী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিতভাবে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে ২০০১ থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার আইন ও শরীয়াহ্ অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ আইসিআরসি আয়োজিত সাউথ এশিয়ান টিচিং সেশন (স্যাটস) কর্মশালায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে আসছেন।

"ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন" বিষয়ক বইটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এবং আইসিআরসির একটি যৌথ প্রকাশনা। আইনের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে কাজ করবে।

* * *

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূল বিষয়সমূহ

ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটারিয়ান ল্ (আইএইচএল) কি?

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (আইএইচএল) হলো সমষ্টিগত একটি নীতিমালা যার উদ্দেশ্য সশস্ত্র সংঘাতের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণকে সীমিত রাখা। এর মূল ধারাগুলো গঠিত হয় ১৯৪৯'সন-এর জেনেভা কনভেনশনে যেটি বাংলাদেশ সাক্ষর করেছে ১৯৭২ সালে।

- আইএইচএল সংঘাতে লিপ্ত পক্ষসমূহের ওপর যুদ্ধের অস্ত্র ও কলাকৌশল অবলম্বনে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে।
- যে সকল ব্যক্তিবর্গ সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করে না বা আর করছে না, আইএইচএল তাদের সুরক্ষা করে।
- আইএইচএল 'যুদ্ধের আইন' অথবা 'সশস্ত্র সংঘাতের আইন' নামেও পরিচিত।

আইএইচএল কেন গুরুত্বপূর্ণ?

যুদ্ধের সময়ে ব্যাক্তির নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য আইএইচএল একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। 'যুদ্ধেরও যে সীমা আছে', এই নীতি মেনে আইএইচএল সংঘাতের মাঝে মানবতার একটি আবহকে সংরক্ষণ করবার চেষ্টা করে।

"জেনেভা কনভেনশনস (...) সর্বদা দৃঢ়ভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় পরস্পরের প্রতি যত্নবান হবার দায়িত্ববোধ সম্পর্কে"

নেলসন ম্যান্ডেলা

আইএইচএল কিভাবে সুরক্ষা প্রদান করে?

আইএইচএল সংঘাতে লিপ্ত পক্ষসমূহের সংঘর্ষকালীন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রতিপক্ষের হাতে আটক বন্দীদের নিরাপত্তা বিধান করে। এছাড়াও এই আইন ঃ

- সংঘাতের সাথে জড়িত পক্ষসমূহের জন্য আবশ্যকীয় করে যে তারা সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের মাঝে পার্থক্যকরণ করবে এবং বেসামরিক লোকজনকে আক্রমণ করা হতে বিরত থাকবে;

- যে সকল অস্ত্রের ব্যবহার অত্যন্ত নৃশংস বা যেগুলো সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের মাঝে পার্থক্যকরণ করতে পারে না, সে সকল অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ বা সীমিত করে;

- সংঘাতে জড়িত পক্ষসমূহের ওপর আরোপ করে যে তারা যুদ্ধে আহত ও অসুস্থদের সেবা প্রদান এবং চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে;

- সংঘাতের সাথে জড়িত পক্ষসমূহের জন্য আবশ্যকীয় করে যে তারা যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক অন্তরীন ব্যক্তিদের মর্যাদা নিশ্চিত করতে, আইসিআরসি'র প্রতিনিধিদের বন্দীশালাগুলো পরিদর্শন করবার সুযোগ দেবে।

আইএইচএল কখন কার্যকরী হবে?

আইএইচএল তিনটি পরিস্থিতিতে কার্যকরী হবে ঃ

- আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাত, যেখানে অন্তত দুটি দেশ জড়িত;

- একটি দেশের সম্পূর্ণ অথবা এর আংশিক ভূখন্ড যখন কোন বিদেশী শক্তি দ্বারা অধিকৃত থাকে;

- একটি দেশের ভেতর যখন সশস্ত্র সংঘাত ঘটে (যেমন সরকারী বাহিনীর সাথে এক বা একাধিক সংগঠিত সশস্ত্র বাহিনীর সংঘাত, অথবা বিভিন্ন সংগঠিত সশস্ত্র বাহিনীর একে অন্যের সাথে সংঘাত)

যে পক্ষই সংঘাতের সূত্রপাত করে থাকুক না কেন, আইএইচএল সংঘাতে লিপ্ত সকল পক্ষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

আইএইচএল কাদের সুরক্ষা দেয়?

যোদ্ধা এবং যে সকল ব্যক্তি সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করে না বা আর করছে না, যেমন বেসামরিক ব্যক্তি, চিকিৎসা সেবা ও ধর্মীয় দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি,

আহত, অসুস্থ ও জাহাজডুবির শিকার সৈনিক, যুদ্ধবন্দী এবং বেসামরিক অন্তরীণ ব্যক্তিবর্গকে আইএইচএল সুরক্ষা প্রদান করে থাকে ।

নারী এবং শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করে আইএইচএল তাদের বাড়তি সুরক্ষা প্রদান করে ।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি)-এর ভূমিকা

১৯৪৯ সনের ৪টি জেনেভা কনভেনশন এবং এর তিনটি অতিরিক্ত প্রটোকলের ওপর ভিত্তি করে, আইসিআরসি আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (আইএইচএল)-এর অভিভাবকত্ব পালন করে থাকে। এই চুক্তিগুলো আইসিআরসিকে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবার অধিকার দেয় ঃ

- আহত, অসুস্থ অথবা জাহাজডুবির শিকার সামরিক ব্যক্তিবর্গের জন্য ত্রান সহায়তা;
- যুদ্ধবন্দীদের পরিদর্শন;
- সংঘাতের কারণে বিচ্ছিন্ন পরিবারের সদস্যদের মাঝে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন;
- বেসামরিক জনগণকে সহায়তা প্রদান;
- মানবিক আইনের দ্বারা সুরক্ষিত ব্যাক্তিদের প্রতি ‘এর’ ধারা অনুযায়ী যথাযথ আচরণ নিশ্চিত করা ।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষে ২০০৬ সন থেকে আইসিআরসি বাংলাদেশ সরকার, সামরিক বাহিনী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিতভাবে কাজ করছে ।

* * *

কুরআন কারীম ও জেনেভা কনভেনশনের আলোকে মানব মর্যাদা

মুহাম্মদ এরেকসূসী
সাবেক ইমাম জেনেভা ইসলামী সংস্থা

ভূমিকা

সকল নবীর ভাষায় আসমানী ধর্ম মানুষের মনে যে মূলনীতি বদ্ধমূল করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক জেনেভা কনভেনশন তার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। আর তা হলো আল্লাহতা'আলা তাঁর অনুগ্রহে অন্য সকল সৃষ্টি থেকে মানুষকে পৃথক এক মর্যাদায় বিশেষিত করেছেন যাকে আমরা 'মানব মর্যাদা' নামে আখ্যায়িত করতে পারি। বিভিন্ন প্রসঙ্গে কুরআন কারীম বহুস্থানে মানব মর্যাদার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে এবং প্রকাশ্যে তার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে। তাই সূরা আত-তীন-এ দৃঢ় শপথ করার পর বিষয়টির উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۝١ وَطُورِ سِينِينَ ۝٢ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۝٣ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤ ﴾ [التين: ١، ٤]

"শপথ 'তীন' ও 'যায়তূন'-এর, শপথ 'সিনাই' পাহাড়ের এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর, আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে" (সূরা আত-তীন : ১-৪)।

এ প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ বলেন :

﴿ ۞وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٧٠ ﴾ [الاسراء: ٧٠]

"আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি। তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের উপর এদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭০)।

ফেরেশতাগণ নূরানী সত্তা, উপরন্তু আল্লাহর আনুগত্য ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে উন্নত আদর্শ। এতদসত্ত্বেও কুরআন কারীম এ বিষয়ের উপর জোর তাগিদ প্রদান করেছে যে, তাদের তুলনায় মানব জাতির সম্মান ও মর্যাদা উচ্চ। তার বড় প্রমাণ হলো, কুরআন কারীম যখনই আদম সৃষ্টির প্রসঙ্গ আলোচনা করেছে তখনই ফেরেশতার উপর তার মর্যাদার বিষয়টি উত্থাপন করতে গিয়ে উল্লেখ করেছে যে, ফেরেশতাদেরকে দিয়ে তাঁকে সিজদা করানো হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া হিসেবে প্রদত্ত এ সম্মান বহু আয়াতে বিধৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সূরা আল-আ'রাফের বর্ণনাটি আমাদের জন্য যথেষ্ট। সেখানে এসেছে :

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿١١﴾﴾ [الاعراف: ١١]

"আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে আকৃতি প্রদান করেছি, তারপর ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম আদমকে সিজদা করতে; ফলে ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করেছিল। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।" (সূরা আল-আ'রাফ : ১১)।

জেনেভা কনভেনশন এখানে কুরআন কারীমের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছে। কারণ কুরআন এ মর্যাদাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্থান হিসেবে গ্রহণ করা আবশ্যক করে দিয়েছে। এ মর্যাদা রক্ষার তাগিদে আল্লাহর জান্নাত থেকে ইবলীসের বহিষ্কার ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইবলীস কর্তৃক মানব মর্যাদাকে অস্বীকার করা এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন না করা ছিল জান্নাত থেকে ইবলীসের বহিষ্কারের কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّٰغِرِينَ ﴿١٣﴾﴾ [الأعراف: ١٢، ١٣]

"আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করল যে তুমি সিজদা করলে না?' সে বললো, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে কাদা-মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছ।' তিনি বললেন, 'এখান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে এটা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত' (সূরা আল-আ'রাফ : ১২-১৩)।

মানব মর্যাদার অস্বীকৃতি যখন আল্লাহর রহমত থেকে বহিষ্কারের কারণ ঘটায় তখন মু'মিনদের মধ্যে কে নিজে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর রহমত থেকে বহিস্কৃত হবার ধৃষ্টতা দেখাবে? মানব মর্যাদা অস্বীকার করা এমন একটি বিষয় যাতে ইবলীস ছাড়া আর কেউ সন্তুষ্ট হয় না। সুতরাং কে নিজে ইবলীস হতে সন্তুষ্টি বোধ করবে?

কুরআন কারীম ও জেনেভা কনভেনশনের ঐকমত্য শুধুমাত্র মানব মর্যাদাকে মূলনীতিরূপে গ্রহণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং কুরআন কারীম ও জেনেভা কনভেনশন উভয়ই মানব মর্যাদার মূলনীতি সংরক্ষণের জন্য মানুষের ওপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছে যাকে সংক্ষেপে দুভাগে ভাগ করা যায়:

প্রথমত; ব্যক্তি সত্তার মর্যাদা তথা একজন মানুষের ব্যক্তিগত সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা এবং অধঃপতন থেকে তাকে সংরক্ষণের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত; অন্য ব্যক্তিদের মর্যাদা রক্ষার জন্য একজন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রথমত : ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য

কোনো মু'মিনের জন্য তার সৃষ্টিকর্তাকে ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা বৈধ নয়। তাই ইসলামী বিধান হলো, সে সূর্য, চন্দ্র, পাথর, মূর্তির প্রতি অবনত হবে না। কোনো মানুষকে সে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করবে না। সে তার প্রতিটি কর্মে নিজের উপর নির্ভর করে যথাযথভাবে উপায়-উপকরণসমূহ ব্যবহার করবে এবং ফলাফলের ব্যাপারে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে। এ-ই ইসলামের বিধান। এমনিভাবে স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব করাও কোনো মু'মিনের জন্য বৈধ নয়, না শান্তিকালীন সময়ে আর না যুদ্ধাবস্থায়। সে

পানাহার ও বেশভূষায় অপচয় করবে না; বরং তার মর্যাদার দাবী হলো, সব সময়ই সে স্মরণ রাখবে যে, তার ছোট-বড় সকল কর্মের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এটিই হলো শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসের মর্মকথা, যা একজন মু'মিনকে স্বীয় মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে সৎকাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এটা উন্নত মানবতার পরিচায়ক। মু'মিনের কর্তব্য হলো এ মর্যাদা ও তার আনুসঙ্গিক বিষয়সমূহের কথা মানুষকে অবগত করানো, যাতে ব্যাপক জনগোষ্ঠী সেটা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উক্ত মর্যাদার হেফাজত ও সংরক্ষণে এবং তার প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রাখতে পারে।

এসবের সাথে আরো একটি বিষয় সংযোজন করা প্রয়োজন যে, মু'মিন কোনো সমস্যায় নিপতিত হয়ে অথবা বিপদগ্রস্ত হয়ে হা-হুতাশ করবে না বরং ধৈর্যধারণ করবে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার এ বিপদ দূরীভূত না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোনোরূপ শারীরিক ক্লেশ বা মানসিক দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবে না। কুরআন কারীম এ কথারই সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করেছে সূরা আসর-এর মধ্যে। ইরশাদ হয়েছে :

﴿وَٱلۡعَصۡرِ ۝١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ۝٣﴾ [العصر: ١، ٣]

"মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়"। [সূরা আল-আসর : ১-৩]

জেনেভা কনভেনশনও পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং সৎকর্মের প্রতি আহবান করে, এর বাইরে কিছু নয়।

দ্বিতীয়ত : অন্যের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব-কর্তব্য

জেনেভা কনভেনশন যেহেতু একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যা অন্যের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছে সেহেতু আমরা বলতে পারি যে, অন্যের সম্মান ও মর্যাদা দানের শিক্ষা বিষয়ক কুরআন কারীমের বহু নীতিই জেনেভা কনভেনশনের গৃহীত নীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। অন্য ব্যক্তিদের মর্যাদা রক্ষার জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য নীচে আলোচিত হলো।

১. সাম্য সংরক্ষণ করা:

অন্যের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের প্রথম ধাপ হলো সকল মানুষের জন্য সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে একই নীতি ও মানদণ্ড স্থাপন করা। কুরআন কারীম দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এটিই ঘোষণা করেছে। তেমনিভাবে জেনেভা কনভেনশনও তা ঘোষণা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আহত ও অসুস্থ ব্যক্তিগণের চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে জেনেভা কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১২-তে বলা হয়েছে, "সশস্ত্র ও নিরস্ত্র জনগণ নির্বিশেষে সকল আহত ও রোগক্লিষ্ট মানুষের প্রতি সর্বাবস্থায় মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের সম্মান রক্ষা করতে হবে। আর যুদ্ধ বা বিবাদের সময়ও যারা বন্দী হয়ে আসবে অথবা কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রাধীনে আসবে তাদের সাথে মানবিক আচরণ করতে হবে। জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা বা রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা নির্বিশেষে কোনো ব্যক্তির সাথে বৈষম্য না করে সকলের সাথে নম্র ব্যবহার ও আচরণ করতে হবে।

কুরআন কারীম সাম্যের এ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেছে :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١﴾ [النساء:١]

"হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন হতে অগনিত নারী ও পুরুষ। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, যার নামে তোমরা একে অন্যের কাছে সাচঞা করে থাকো এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতকর্তা অবলম্বন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন" (সূরা আন-নিসা : ১)।

সাম্য যে ব্যাপক সে সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুতাওয়াতির তথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে। তিনি বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেন, "হে মানব! তোমাদের ইলাহ বা মা'বুদ এক। তোমরা প্রত্যেকেই আদম থেকে এসেছো, আর আদম সৃষ্টি হয়েছেন মাটি থেকে। কোনো আরবের উপর কোনো অনারবের এবং কোনো

অনারবের উপর কোনো আরবের, কোনো লাল ত্বকের মানুষের কোনো সাদা ত্বকের মানুষের উপর এবং কোনো সাদা ত্বকের মানুষের কোনো লাল ত্বকের মানুষের উপর কোনরূপ প্রাধান্য নেই তাকওয়ার ভিত্তি ছাড়া''। তিনি আরো বলেন, ''মানুষ চিরুনীর দাঁতের ন্যায় সবাই সমান''।

এ ধরনের আরো বহু হাদীস রয়েছে যেগুলো নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো এমন মনীষীর মুখ হতে নিসৃত যিনি মনগড়া কথা বলেননি। এ থেকে গুরুত্বের সাথে আমরা জানতে পারি যে, মানব মর্যাদার ক্ষেত্রে ইসলাম তার কিতাব ও তার রাসূলের মাধ্যমে সকল মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে; তা তাদের বাসস্থান, তাদের জাতি অথবা তাদের বর্ণ যতো পৃথকই হোক না কেন। কুরআন কারীম বিভিন্ন রাসূলের উম্মতদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছে যে, মানব মর্যাদায় সবাই সমান। তাই রাসূলদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٥١ وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱتَّقُونِ ٥٢﴾ [المؤمنون: ٥١، ٥٢]

''হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি সবিশেষ অবহিত। আর আপনাদের এই যে জাতি, এ তো একই জাতি এবং আমিই আপনাদের রব; অতএব আমারই তাকওয়া অবলম্বন করুন।'' (সূরা মু'মিনূন : ৫১-৫২)।

তাই আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন কারীম ও জেনেভা কনভেনশন উভয়টিই মানবিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সাম্যের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে; বিশেষ করে সেসব লোকের ক্ষেত্রে যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। জেনেভা কনভেনশনের অভিন্ন অনুচ্ছেদ ৩ এ বলা হয়েছে যে, সশস্ত্র যুদ্ধের মুহূর্তে প্রত্যেক পক্ষের উচিত ন্যূনপক্ষে নিম্নোক্ত বিধানগুলোর ওপর ঐকমত্য পোষণ করা :

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মধ্যেও যারা আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ করবে না, যাদেরকে অসুস্থতা, আহত হওয়া, বন্দী হওয়া বা অন্য যে কোনো কারণে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা হয়, সর্বাবস্থায়ই তাদের সাথে মানবিক আচরণ করতে হবে। বর্ণ, রং, ধর্ম, বিশ্বাস, লিঙ্গ, বংশ, অথবা সম্পদের কারণে এ আচরণের মধ্যে কোনোরূপ ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে না।

ফির'আউন-কর্তৃক তার লোকজনকে বিভিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা, অতঃপর স্বগোত্রকে সম্মান দান করা এবং অন্য পক্ষকে হীনবল করার নীতিকে মানব মর্যাদা তথা সমতা রক্ষার মূলনীতির ভিত্তিতে কুরআন কারীম ভৎর্সনা করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِۦ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۝٤﴾ [القصص: ٤]

"ফির'আউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের এক শ্রেণীকে হীনবল করেছিল; তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত রাখতো। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।" (সূরা কাসাস : ৪)।

অতএব কুরআনুল কারীম মর্যাদার ক্ষেত্রে সব মানুষের মধ্যে সমতা বিধানের স্বীকৃতি না দেওয়াকে ফির'আউনী চরিত্রের কাজ বলে সাব্যস্ত করেছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ফির'আউন বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবার উপযুক্ত।

স্বভাবতই মর্যাদার ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো, মানুষের পারস্পরিক আচার-আচরণে সমতার প্রভাব পরিদৃষ্ট হওয়া। সে আচার-আচরণ হওয়া বাঞ্ছনীয় পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে। কুরআন কারীম সে শ্রদ্ধা ও সম্মানের প্রকাশার্থে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে এবং অন্যের সম্মানহানীকর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۝١١ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ

بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَ لَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ ﴾ [الحجرات: ١١، ١٢]

"হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অন্য কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অন্য কোনো নারীকে যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নাম খুবই খারাপ। আর যারা তওবা না করে তারাই জালিম"। "হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাকো; কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ। আর তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের পিছনে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে করো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু" (সূরা হুজুরাত : ১১-১২)।

আয়াত এবং এ জাতীয় আরো যেসব আয়াত আছে তা আমাদেরকে যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণের ব্যাপারে জেনেভা কনভেনশন ৩-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর ৯২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "যে যুদ্ধবন্দী পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে কিন্তু পালিয়ে যেতে সক্ষম হবার পূর্বেই ধৃত হবে তাকে এ কাজের ফলে কেবল শিক্ষামূলক শাস্তি দেওয়া হবে। এমনকি পলায়ন করে পুনরায় ফিরে আসার ক্ষেত্রেও একই শাস্তি প্রযোজ্য হবে।" এখানে 'এ কাজের ফলে কেবল শিক্ষামূলক শাস্তি দেওয়া হবে' - এ কথার দ্বারা এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য সব রকমের ধারণা ও অপবাদ দূর করে দেয়া হয়েছে।

একবার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন কুরাইশ নেতার সাথে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। ইত্যবসরে এক অন্ধ এসে তার কাছে কুরআন সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশংকা করলেন যে, তিনি যদি অন্ধের প্রতি মনোযোগ দেন তাহলে

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ দূরে সরে যাবেন, যাদের ইসলাম গ্রহণের তিনি আকাংক্ষা করছিলেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধ লোকটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখনই তাঁর এ আচরণের জন্য তাঁকে কঠোরভাবে ভৎর্সনা করে কুরআন কারীমের আয়াত নাযিল হয়, যদিও তিনি অন্ধের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করেননি; বরং তিনি আশংকা করেছিলেন যে, কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সামনে তিনি তাদেরকে রেখে অন্ধের প্রতি মনোযোগ দিলে তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে। এ ঘটনার সাথে সাথেই আয়াত নাযিল করে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ধরনের আচরণ করতে নিষেধ করা হয় এবং এ ব্যাপারে তাঁকে ভৎর্সনা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ۝١ أَن جَآءَهُ ٱلۡأَعۡمَىٰ ۝٢ وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ ۝٣ أَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكۡرَىٰٓ ۝٤ أَمَّا مَنِ ٱسۡتَغۡنَىٰ ۝٥ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ۝٦ وَمَا عَلَيۡكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۝٧ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسۡعَىٰ ۝٨ وَهُوَ يَخۡشَىٰ ۝٩ فَأَنتَ عَنۡهُ تَلَهَّىٰ ۝١٠ كَلَّآ إِنَّهَا تَذۡكِرَةٞ ۝١١ ﴾ [عبس: ١، ١١]

"তিনি ভ্রু কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কারণ তাঁর নিকট অন্ধ লোকটি আসলো। আপনি কেমন করে জানবেন- সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে সে উপদেশ তার কাজে আসতো! পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না, আপনি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোনো দায়িত্ব নেই। অপরপক্ষে যে আপনার দিকে ছুটে আসলো, আর সে ভয় করে, আপনি তাকে উপেক্ষা করলেন। কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশ বাণী" (সূরা 'আবাসা : ১-১১)।

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব আল্লাহর নির্বাচিত ও মনোনীত রাসূলকেই যখন এমন কঠোরভাবে ভৎর্সনা করা হয়েছে, তাও এ জন্য নয় যে, তিনি তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন বা তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছিলেন; বরং শুধুমাত্র এ জন্য যে, অন্ধের প্রতি অমনোযোগী হয়ে তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে তাদের ইসলাম গ্রহণের আশায় সাময়িকভাবে সুন্দর আচরণ করেছিলেন; তখন আর কে আছে যে উক্ত অপরাধ ও পাপের কাজ করবে এবং তা থেকে ফিরে না এসে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার ধারণা করবে?

সুতরাং মুমিনের কর্তব্য হলো অন্যের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় সকলের ক্ষেত্রে সম আচরণ করা। জেনেভা কনভেনশন যেখানে শত্রু ও প্রতিপক্ষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার কথা বলে সেখানে কুরআনে মাজীদের মানব মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠা বিষয়ক সাধারণ আয়াতসমূহ পালন করার পাশাপাশি আমাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রতিপক্ষ সম্পর্কিত কুরআনের বিশেষ নির্দেশনা সম্বলিত বর্ণনাসমূহও বাস্তবায়ন করা।

২. ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন

প্রতিপক্ষের মানবিক মর্যাদা ও তার সম্মান রক্ষার ন্যূনতম উপযোগী আচরণ হচ্ছে, তার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করা। এ জন্যই কুরআন ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বনের নির্দেশ সম্বলিত আয়াতসমূহ বারবার নিয়ে এসেছে এবং এ কথার তাগিদ দিয়েছে যে, ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করা অবশ্য কর্তব্য, যদিও তা প্রতিপক্ষের সাথে হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨﴾ [المائدة: ٨]

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে, কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়পরায়ণতা পরিত্যাগ করো না। ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করবে, এটা আল্লাহ্ ভীতির অধিক নিকটবর্তী। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে। তোমরা যা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত" (সূরা আল-মায়েদা : ৮)।

আমাদের আচরণে মানুষ যাতে বুঝতে পারে যে, প্রতিপক্ষের সাথে ন্যায় বিচার করা বলতে বোঝায় দুজন শত্রুর মধ্যে সংঘটিত বিবাদের ন্যায়ানুগ ফয়সালা করা। কুরআন কারীম গুরুত্বের সাথে ঘোষণা করেছে যে, ন্যায় বিচার করা অবশ্য কর্তব্য যদিও তার ফায়সালা মুমিন ব্যক্তির নিজের বিরুদ্ধে হয় এবং প্রতিপক্ষের পক্ষে যায় এবং যদিও তার নিকটতম ব্যক্তি যেমন পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥﴾ [النساء: ١٣٥]

"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ। যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক, আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচানো কথা বলো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তাহলে তোমরা যা করো আল্লাহ তো তার সম্যক খবর রাখেন।" (সূরা আন-নিসা : ১৩৫)।

এমনিভাবে ইসলামের শিক্ষা ও জেনেভা কনভেনশনের নীতিমালা একসূত্রে গ্রথিত। ন্যায় বিচারের দাবিই হলো অভিযুক্তকে বিভিন্ন উপায়ে তার আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ প্রদান করা। জেনেভা কনভেনশন ৩-এর অনুচ্ছেদ ৮৪-তে এটিই নিশ্চিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "যুদ্ধবন্দীকে কোনো অবস্থাতেই এমন আদালতের মাধ্যমে বিচার করা যাবে না যে আদালতে সাধারণভাবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তার পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার গ্যারান্টি নেই; বিশেষত সেখানে তার সাথে এমন কোনো কাজ করা যাবে না যাতে জেনেভা কনভেনশন ৩-এর ১০৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিযুক্তের অধিকার আত্মপক্ষ সমর্থনের উপায়সমূহ অবলম্বনের সুযোগ দেয়া না হয়।" উক্ত ১০৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "যুদ্ধবন্দীর কোনো সহবন্দীর সাহায্য নেয়া, তার মনোনীত যোগ্য আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন করা, সাক্ষী নিয়োগ করা এবং প্রয়োজনবোধে অনুবাদকের সাহায্য নেওয়ার অধিকার রয়েছে"।

৩. প্রতিপক্ষের বিশ্বাসের প্রতি সম্মান করা এবং মালামালের হেফাজত করা

আল-কুরআনুল কারীম সাম্য ও ন্যায় বিচার নীতির পাশাপাশি আরো একটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। তা হলো প্রতিপক্ষের বিশ্বাস ও মালামালের হেফাজত। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে, প্রতিপক্ষের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্যতম আবশ্যকীয় বিষয় হচ্ছে তার বিশ্বাস এবং তার পবিত্র বিষয়গুলোর প্রতি অসম্মান না করা। তাই মুশরিকগণ আল্লাহকে ছেড়ে যেসব

জিনিসের পূজা করে তাকে গালিগালাজ করতে কুরআন কারীম নিষেধ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কুরআন কারীমের যুক্তি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তা হলো, মুশরিকের বিশ্বাসে আঘাত করা হলে তা তাকে মুমিনের বিশ্বাসে আঘাত করার বৈধতা প্রদান করে। তাই মু'মিন যখন তার বিশ্বাসের সম্মান বজায় রাখতে আগ্রহী, তখন তার উচিত অন্যের বিশ্বাসের প্রতি অসম্মান না করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ ﴾ [الانعام: ١٠٨]

"আর আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কারণ তাহলে তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দেবে।" (সূরা আল-আন'আম : ১০৮)।

অনুরূপভাবে কুরআন কারীম মানুষদেরকে তাদের আকিদা-বিশ্বাস পরিবর্তনের জন্য জোর-জবরদস্তি করতে নিষেধ করেছে। ইরশাদ হয়েছে :

﴿ لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]

"দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই। সত্যপথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে।" (সূরা আল-বাকারা : ২৫৬)।

আত-তাবারী প্রণীত 'তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক' গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আল-কুদস তথা ফিলিস্তীন বাসীদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে নিজের উপর যে শর্ত আরোপ করে নিয়েছিলেন তাতে ছিল, "তাদের জান-মাল, গীর্জা, ক্রুশ, ভালো লোক, মন্দ লোক এবং গোটা জাতিকেই নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। তাদের গীর্জাসমূহকে বাসগৃহ বানানো যাবে না এবং ধ্বংসও করা যাবে না, তার হ্রাস করা যাবে না, তার আয়তন থেকেও কোনো অংশ হ্রাস করা যাবে না, তাদের ক্রুশ ভাঙ্গা যাবে না, তাদের সম্পদেরও কোনো ক্ষতি করা যাবে না, তাদের দ্বীনের উপর কোনো জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। তাদের কারো কোনোরূপ ক্ষতি করা যাবে না।"

এ চুক্তিপত্র আমাদেরকে জেনেভা কনভেনশনের বহু অনুচ্ছেদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ৫৩ নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ করাই আমরা যথেষ্ট মনে করছি। সেখানে বলা হয়েছে, "দখলদার কোনো

রাষ্ট্রের উপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে যে, তারা সেখানকার কোনো ব্যক্তির, দলের, রাষ্ট্রের অথবা কোনো সামাজিক সংগঠনের বা সাহায্য সংস্থার মালামাল এবং স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট করবে। তবে যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যক্রমের ফলে যদি এ ধরনের ধ্বংস বা বিনষ্টকরণ অবধারিত হয়ে পড়ে তাহলে তা ভিন্ন কথা।"

৪. দয়া ও সদাচরণ করা

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সাম্য, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বাসের মর্যাদা এবং মালামালের সংরক্ষণ করা হচ্ছে মানব মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সর্বনিম্ন নির্দেশনা। সুতরাং এগুলো বিনষ্ট করা বৈধ নয়। কিন্তু কুরআন কারীম এর থেকেও উঁচু স্তরের নির্দেশনা প্রদান করেছে। জেনেভা কনভেনশন কুরআন কারীমের সাথে ন্যায় বিচারের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছে। কুরআন কারীম এ ব্যাপারে মুমিনদেরকে আরো উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করেছে যে, তারা যেন প্রতিপক্ষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে শুধু ন্যায় বিচারের উপরই সীমিত না থাকে, বরং ন্যায় বিচারের সাথে সাথে সদাচরণ ও দয়াও যেন প্রাধান্য পায়। তাই কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

﴿ ۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ [النحل: ٩٠]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।" (সূরা আন-নাহ্‌ল : ৯০)।

সদাচরণের কয়েকটি স্তর আছে। প্রথম স্তর হলো, প্রতিপক্ষের অপরাধ ক্ষমা করা, তার পক্ষ থেকে যে কষ্ট পাওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা। কারণ হয়তো বা আল্লাহ তার শত্রুতাকে ভালবাসায় রূপান্তরিত করে দেবেন। নিম্নলিখিত আয়াতে এ কথাই ভাস্বর হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ সূরা আশ-শূরায় আমরা দেখতে পাই, মুমিনদেরকে ক্ষমার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

﴿ وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٠ ﴾ [الشورى: ٤٠]

"মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। আর যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। নিশ্চয় তিনি জালিমদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আশ-শূরা: ৪০)। সূরা মুমতাহিনায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجۡعَلَ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَ ٱلَّذِينَ عَادَيۡتُم مِّنۡهُم مَّوَدَّةٗۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٞۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٧﴾ [الممتحنة: ٧]

"যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবত আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (সূরা আল-মুমতাহিনা : ৭)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, উহুদ যুদ্ধে মুশরিকরা যখন তাঁর চাচা হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্য শহীদদের নাক-কান কেটে বিকৃত করে ফেললো তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ যদি তাদের বিরুদ্ধে আমাকে বিজয় দান করেন তাহলে অবশ্যই আমি তারা যে রকম নাক-কান কেটে বিকৃত করেছে তার দ্বিগুণ তাদেরকে বিকৃত করবো'। এমতাবস্থায় কুরআন কারীম নিশ্চুপ থাকেনি; বরং সাথে সাথেই ওহী নাযিল হলো :

﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ وَلَئِن صَبَرۡتُمۡ لَهُوَ خَيۡرٞ لِّلصَّٰبِرِينَ ١٢٦﴾ [النحل: ١٢٦]

"যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাই তো উত্তম।" (সূরা আন-নাহল : ১২৬)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'বরং আমরা ধৈর্যধারণ করবো'। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামই যখন ধৈর্যধারণ করেছেন এবং শত্রুগণ তাঁর চাচা ও তাঁর উত্তম সাহাবীগণের প্রতি যে জঘন্য আচরণ করেছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, তখন সাধারণ মু'মিনের জন্য শত্রুর অপরাধ ক্ষমা করা এবং আল্লাহর রাস্তায় প্রতিপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রচণ্ড আঘাত ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা কতোখানি উচিত তা সহজেই অনুমেয়। কারণ মুমিন তো এ আঘাত সেই আল্লাহর পথেই পেয়েছে যিনি প্রতিপক্ষ ও বন্ধুর মধ্যে একটি মর্যাদা সমভাবে

প্রদান করেছেন, যা হলো মানব মর্যাদা। ইচ্ছা করলে আল্লাহ শত্রুকেও বন্ধু বানিয়ে দিতে পারেন। প্রতিপক্ষের মন্দ আচরণের ক্ষেত্রেও যখন তার সাথে সদাচার করা একান্ত কর্তব্য তখন সন্দেহ নেই যে, তার পক্ষ থেকে কোনো রকম মন্দ আচরণ না করা হলে তার প্রতি সদাচার করা আরো বেশী কর্তব্য এবং সেটাই উত্তম।

কুরআন কারীম আরো একটি নির্দেশ দিয়েছে যা ক্ষমা থেকে আরো উঁচুস্তরের। তা হলো, মন্দ আচরণের পরিবর্তে উত্তম আচরণ করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿وَلَا تَسْتَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝٣٤﴾ [فصلت: ٣٤]

"ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো।" (সূরা ফুসসিলাত : ৩৪)।

মূলনীতি সমূহের বাস্তব প্রয়োগ

কুরআন কারীম যেখানে মানব মর্যাদার মূলনীতিসমূহ পেশ করেছে সেখানে জেনেভা কনভেনশনও সেসব মূলনীতির প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেছে। যেমন মানব মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা এবং এ সম্মান প্রদর্শনের যত পন্থা রয়েছে যেমন সাম্য, ন্যায় বিচার, সদাচরণ প্রভৃতি সেগুলো সাধারণ মানুষের সাথে তো বটেই, প্রতিপক্ষের সাথেও প্রদর্শন করা। এসব ক্ষেত্রে আল-কুরআনুল কারীম যে মূলনীতি পেশ করেছে তার সাথেও জেনেভা কনভেনশন একাত্মতা পোষণ করেছে, তা যুদ্ধের সময়ে হোক বা শান্তি ও নিরাপত্তার সময়ে হোক। এখানে উক্ত একাত্মতার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরাই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

১. জেনেভা কনভেনশন সে সকল লোককে রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালায় যারা আক্রমণাত্মক কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করে না, বিশেষত স্বাস্থ্যকর্মী, আহত ও অসুস্থ সৈনিক, পানিতে নিমজ্জিত ব্যক্তি এবং যুদ্ধবন্দী অথবা বেসামরিক লোকসকল যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না। কুরআন কারীম

যুদ্ধের জন্য কিছু সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, যুদ্ধ কেবল তাদের সাথেই সীমাবদ্ধ থাকবে যারা যুদ্ধ করে। অতঃপর যখন সে সীমা অতিক্রম করবে তখন তা হয়ে যাবে সীমালঙ্ঘন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠ ﴾
[البقرة: ١٩٠]

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো কিন্তু সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘন কারীদের ভালবাসেন না।" (সূরা আল-বাকারা : ১৯০)। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা তাঁর সাহাবীদেরকে উপদেশ দিতেন যে, তারা যেন কোনো শিশু, মহিলা বা গীর্জায় উপাসনাকরীদেরকে হত্যা না করে।

২. জেনেভা কনভেনশন রেডক্রস বা রেডক্রিসেন্টের আড়ালে আত্মগোপন করে আক্রমণ করা অথবা হাসপাতালের অভ্যন্তরে অবস্থান করে শত্রুর প্রতি কোনো রকম আক্রমণ বা তার ক্ষতিসাধন করতে নিষেধ করেছে। ইসলামের পূর্বে আরবগণ হাসপাতাল চিনতো না। তবে তারা কোনো কোনো স্থানে যুদ্ধ করা হারাম হবার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করতো, যেমন মসজিদে হারামে। কুরআন কারীম এ ঐকমত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে এবং তার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। ইরশাদ হয়েছে :

﴿وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ﴾ [البقرة: ١٩١]

"মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না, যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে।' (সূরা আল-বাকারা : ১৯১)।

৩. জেনেভা কনভেনশনের দাবী হলো, যুদ্ধবন্দীদের সাথে সুন্দর আচরণ করা আর কুরআন কারীমও মু'মিনদের পক্ষ থেকে খুবই উঁচুস্তরের সদাচার দাবী করেছে। আর তা হলো, মন্দের প্রতিদানে ভালো আচরণ করা। যুদ্ধবন্দী

দাসদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তারা তোমাদের ভাই, তোমাদের সহযোগী। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং যার ভাই তার অধীনে আছে সে যেন নিজে যা আহার করে তাকেও তাই আহার করায় এবং নিজে যা পরিধান করে তাকেও তাই পরিধান করায়। আর তোমরা যেখানে বসবাস করো তাদেরকেও সেখানেই বসবাস করতে দাও এবং তাদের উপর তাদের সাধ্যের অতীত কোনো কাজ চাপিও না। যদি কোনো কাজের দায়িত্ব দাও তবে সে কাজে তোমরা তাদেরকে সাহায্য করো।’

যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদাচরণে উদ্বুদ্ধ করে কুরআন কারীমে উক্ত হয়েছে :

﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝٥ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝٦ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ۝٧ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ۝٩ ﴾
[الانسان: ٥، ٩]

“নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কাপুর মিশ্রিত পানপাত্রে। এটা একটা ঝরনা যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা একে প্রবাহিতও করবে। তারা কর্তব্য পালন করে এবং সেই দিনের ভয় করে যেদিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক। তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। তারা বলে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।” (সূরা আদ-দাহর : ৫-৯)।

পরিশেষে বলতে হয়, ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানব মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ প্রদান, এমনকি যদি প্রতিপক্ষের বেলায়ও হয়। তবে ইসলাম সেটাকে কেবল আশা-আকাংক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি; বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে তার সত্যতা প্রমাণ করেছে। তার দু-একটি নজিরই আমাদের জন্য যথেষ্ট। মানুষের ব্যক্তিগত মর্যাদা যে বিনষ্ট করে অথবা অন্যের সম্মানহানী করে, মুসলিম খলীফা-কর্তৃক তার প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার রয়েছে। এমনকি লাঞ্ছিত ব্যক্তি যদি তার রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষও হয়।

এ কারণে খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মিসর বিজয়ী 'আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্রকে ভৎর্সনা করেছিলেন এ কারণে যে, তার পিতা বিজয়ীর বেশে যে দেশে প্রবেশ করেছিলেন সে দেশেরই একজন নাগরিকের মর্যাদা সে ক্ষুন্ন করেছিল। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু (তা জানতে পেরে) সে সন্তানের পিতা 'আমর ইবনুল 'আসের কাছে লিখে পাঠালেন যে, "কবে থেকে তোমরা লোকজনকে দাস বানিয়ে নিয়েছ অথচ তাদের মাতা স্বাধীনরূপে তাদেরকে জন্মদান করেছে।" শীঘ্রই তিনি প্রহৃত কিবতী ও প্রহারকারী আমর তনয়কে ডেকে পাঠালেন এবং কিবতীর হাতে চাবুক তুলে দিয়ে মিসর বিজয়ীর পুত্রকে প্রহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে বললেন, "সম্মানিতদের পুত্রকে প্রহার করো।" এটাই হলো দুনিয়াতে মানব মর্যাদা ক্ষুন্নকারীর শাস্তির এক উদাহরণ। দুর্বল আত্মার অধিকারীদেরকে ধমক দেয়া এবং সতর্ক করার জন্য এটাই যথেষ্ট। আর মু'মিন আত্মার অধিকারীদের দৃষ্টি তো এর থেকেও উঁচু পর্যায়ের বিষয়ের প্রতি তথা আল্লাহর দেয়া প্রতিদান ও সম্মানের প্রতি নিবদ্ধ থাকা উচিত। তাদের জন্যই আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣ ﴾ [الحجرات: ١٣]

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়ার অধিকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।" (সূরা আল-হুজুরাত : ১৩)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকওয়ার পথ সুস্পষ্ট করে দিয়ে বলেন, "সকল সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার। তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো সে ব্যক্তি যে তার পরিবারের বেশী উপকার করে।"

* * *

প্রথম অনুবাদ : **ড. আবদুল জলীল**

ইসলামী শরী'য়তে যুদ্ধে আক্রান্ত বেসামরিক জনগণকে রক্ষাকরণ ও ইসলামে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন

প্রফেসর ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলী

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আর সালাত ও সালাম আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ... ।

অতঃপর,

আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের উৎপত্তি দেখা দিয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে যখন জাতিপুঞ্জের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, আর ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে তার সদস্যপদ লাভ করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল এই যুক্তি প্রদর্শন করে যে, এসব রাষ্ট্রের অধিকাংশই ছিল ঔপনিবেশিক শাসন বা ম্যানডেটরি শাসনের অধীন ।

অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ (UN) সার্বভৌমত্বের বিষয়ে সমতার মূলনীতির ভিত্তিতে পৃথিবীতে তার সকল সদস্যকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণ করা অনুমোদন করেছে; যেমন বলা হয়েছে এই সংস্থার সনদের দ্বিতীয় দফার প্রথম অনুচ্ছেদে । সনদের প্রথম দফার ৪ নং অনুচ্ছেদকে জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে । উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ করা; আর ঐ মূলনীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপর ভিত্তি করে জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি করা যে মূলনীতি জাতিসমূহ তথা মানুষের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত

করেছে। তন্মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান বা অধিকার হলো: নিজস্ব অবস্থান গ্রহণের অধিকার; অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা; মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রতকরণ এবং জাতি, ভাষা কিংবা ধর্মের ভিত্তিতে কোনো ব্যবধান তৈরি না করে ও নারী-পুরুষের মাঝে কোনো প্রকার পার্থক্য সৃষ্টি না করে সকল মানুষের জন্য মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। এই সনদের ছায়াতেই আমরা 'ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন' নামের বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হবো; যাতে করে এ আইন-কানুনের মূলনীতিগুলো নিশ্চিত করা যায় এবং মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। নিম্নোক্ত দুটি পরিচ্ছেদে বিষয়টির আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : শান্তি ও নিরাপত্তা থাকাকালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

এ আলোচনায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত :

- ইসলামের শাসনব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সংগঠনের মূলনীতি;
- অন্যান্য রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান;
- শান্তি, মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতিকে তুলে ধরা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ চলাকালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত :

- ইসলামী শরী'য়তে যুদ্ধ অনিবার্য অবস্থায় বৈধ;
- শরী'য়তের দৃষ্টিতে যুদ্ধের শর্তসমূহ;
- ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ - বিগ্রহের কারণ;
- ফিকহ শাস্ত্র-কর্তৃক দুনিয়াকে দুটি বা তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করার তাৎপর্য বর্ণনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ : শান্তি ও নিরাপত্তা থাকাকালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

সর্বজনবিদিত যে, আকিদা, শরী'য়ত, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ব্যাপারে ইসলামের দা'ওয়াত হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রবণতা-বিশিষ্ট দা'ওয়াত যা প্রত্যাশা করে যে, তার কল্যাণ ও মূলনীতিমালা ব্যাপকভাবে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক; এবং তা হোক শুধুমাত্র অর্থনৈতিক, বস্তুগত, জাতিগত, ঔপেনিবেশবাদী, জাতীয়তাবাদী স্বার্থের জন্য নয় বরং সামগ্রিকভাবে দুনিয়া ও আখিরাতে মানবতার মুক্তি, সৌভাগ্য বা সমৃদ্ধি, কল্যাণ, ন্যায়বিচার ও সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার জন্য। কারণ ইসলামী দা'ওয়াতে আকিদা বা বিশ্বাসের রূপ হলো রবুবিয়াত ও ইবাদতের ক্ষেত্রে শির্ক অথবা পৌত্তলিকতার কোনো প্রকার মিশ্রণ ছাড়াই আল্লাহ তা'আলার নির্ভেজাল একত্ববাদের ঘোষণা ও স্বীকৃতি প্রদান করা। সুতরাং এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ তাঁর সকল কিতাবের প্রতি, শেষ দিনের প্রতি এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হচ্ছে এই দ্বীনের মূলনীতি। দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই এবং এই আকিদা প্রচার-প্রসারের ব্যাপারেও কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি নেই; বরং স্বাধীনতা, মন থেকে মেনে নেওয়া, আলোচনা ও উদারতা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বানকারীদের কর্ম তৎপরতার মূল ভিত্তি। মানবিকতা, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান এবং মানব মর্যাদার ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান - এই নীতিও এর অন্তর্ভুক্ত। তাকওয়া (আল্লাহ সচেতনতা) অথবা সৎকর্ম ব্যতীত কোনো দল বা মানুষের অন্যের উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা করার নীতিই হলো প্রত্যাশিত মূলনীতি; আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣﴾ [الحجرات: ١٣]

"হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে বেশি তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ

সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।" (সূরা আল-হুজুরাত : ১৩)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন :

﴿ لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]

"দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে।" (সূরা আল-বাকারা : ২৫৬)।

ইসলামী দা'ওয়াত প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে মূলনীতি ও শ্লোগান হচ্ছে: চিন্তাভাবনা ও যুক্তিকে কাজে লাগানো এবং সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করা; আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের বহু আয়াতে এই প্রসঙ্গে বক্তব্য পেশ করেছেন। তন্মধ্যে একটি আয়াত হলো :

﴿قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ سَوَآءِۭ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَيۡـٔٗا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُولُواْ ٱشۡهَدُواْ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ ٦٤ ﴾
[ال عمران: ٦٤]

"আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া একে অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি।' তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমরা বলো, তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।" (সূরা আল ইমরান: ৬৪)। অন্য আরেকটি আয়াত হলো :

﴿وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ٤٦ ﴾ [العنكبوت: ٤٦]

"আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না, তবে কিতাবীদের মধ্য থেকে যারা যুলুম করেছে তাদের সাথে (বিতর্ক) করতে পারো। আর তোমরা বলো, 'আমাদের প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে আমরা ঈমান এনেছি। আর আমাদের ইলাহ্ ও তোমাদের ইলাহ্ তো একই। আর আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।" (সূরা আল-'আনকাবূত : ৪৬)।

শান্তি ও নিরাপত্তার নীতি হলো শক্ত নীতি যা লংঘন করা কোনো অবস্থাতেই সঙ্গত নয়, তবে অন্যদের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ির অবস্থায় এবং শত্রুরা অস্ত্র-সস্ত্রের দ্বারস্থ হলে ভিন্ন কথা; আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨﴾
[البقرة: ٢٠٨]

"হে মুমিনগণ! তোমরা পুর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা আল-বাকারা: ২০৮) আর মুসলিমগণ এবং আহলে কিতাব তথা কিতাবের অনুসারী ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও অন্যদের মধ্যকার সম্পর্কের নিয়মকানুন হলো এই উৎকৃষ্টতর ও সুস্পষ্ট পদ্ধতি যা নিম্নোক্ত আয়াত দুটির মধ্যে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আয়াত দুটি হলো :

﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨ إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٩﴾
[الممتحنة: ٨، ٩]

"দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। আর তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তারাই তো যালিম।" (সূরা আল-মুমতাহিনা : ৮-৯)।

মুসলিমগণ নবুওয়তের যুগ থেকে শুরু করে দীর্ঘ সময় একটি নীতি মেনে চলেছে; তা হলো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবী ও তাঁর অনুসারীগণ- কর্তৃক বিশ্বের রাজা-বাদশা, আমীর-ওমরা ও সেনাপতিদের নিকট

দা'ওয়াত প্রেরণ করার ক্ষেত্রে একটি মাত্র উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা। আর তা হলো ইসলাম প্রচার। রাসূল বলেন,

(أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين[১]) و﴿ قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ... ﴿٦٤﴾ ﴾ [ال عمران: ٦٤]).

'ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি পাবেন, আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন; আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে আপনার উপর সাধারণ জনগণের পাপের বোঝা আপতিত হবে; এবং' "আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া একে অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি।' (সূরা আল ইমরান : ৬৪)।

বিভিন্ন সময়ে মুসলিমদের সাথে আরব কিংবা অনারবদের যুদ্ধ হয়। এর মধ্যে যেগুলোতে মুসলিমদের উপর যুলুম বা আক্রমন করা হয়েছিল সেগুলোতে মুসলিমগণ-কর্তৃক যুদ্ধের আশ্রয় নেয়াটা ছিল অস্তিত্ব রক্ষা ও শত্রুদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং সমতার ভিত্তিতে সকল জনগোষ্ঠী ও জাতির মধ্যে স্বাধীনতার পতাকার বিস্তারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এখান থেকেই এ সত্য প্রকাশিত হয় যে, মুসলিমরা কোনো অত্যাচারী রাজা, অথবা জালিম শাসক, অথবা কোনো স্বৈরাচারী নেতার আচরণ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে শুধু এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করে ।

বস্তুত 'ইসলামী রাষ্ট্র' হচ্ছে একমাত্র শাসনব্যবস্থা যার মূল বুনিয়াদ হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজকে যে কোনো প্রকার পার্থিব ক্ষমতা এবং বশ্যতা সৃষ্টির প্রবণতা থেকে মুক্ত করে স্বাধীন করা, যে ক্ষমতা ও বশ্যতা তখনকার মানব সমাজে ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান ছিল। ইসলাম এই "ক্ষমতা এবং বশ্যতা" কে পরিবর্তন করে প্রদান করেছে ন্যায়বিচার, পরামর্শ, সমতা, অনুকম্পা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের রূপ। এগুলো হচ্ছে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ইসলামী বুনিয়াদী নীতিমালা।[২]

এসব মূলনীতি ও বক্তব্যের আলোকে ইসলামের ছায়ায়, তার দিক-নির্দেশনায়, তার শরী'য়তে এবং তদনুযায়ী মুসলিমগণের অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আমাদের জন্য 'শান্তি ও নিরাপত্তা' সংক্রান্ত নীতিমালার কেন্দ্রবিন্দুসমূহ নিম্নবর্ণিতভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

১. ইসলামের শাসনব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সংগঠনের মূলনীতি

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মাইলফলক স্থাপনের জন্য ইসলামী শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অনেক। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিগুলো সাধারণভাবে এ রকম :[৩]

প্রথমত : মানবিক ভ্রাতৃত্ব সংরক্ষণ

মুসলিমগণ আল্লাহ তা'আলা-কর্তৃক তাঁর কুরআনে বর্ণিত হিদায়েতকে গ্রহণ করে নিয়েছেন, যখন তা সৃষ্টির ঐক্য (তথা একসত্ত্বা থেকেই সকল মানবকে সৃষ্টি করার তত্ত্ব) ও স্রষ্টার একত্ব এবং মানুষ হিসেবে একত্ব ও সার্বিক মানবিক ভ্রাতৃত্বের বিষয়টি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হলেন সৃষ্টিকর্তা আর মানুষ হচ্ছে তাঁর সৃষ্টি ও কর্ম। তাঁর সৃষ্টিগত ইচ্ছা ও প্রজ্ঞায় তিনি চেয়েছেন যে, মানবকুল তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, আকিদা-বিশ্বাস ও মতবাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হবে; আর সকল মানুষ হবে স্বাধীন, তারা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ওহী এবং প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত আগত সকল রাসূল ও নবীগণের রিসালাতের আলোকে পছন্দ করে নেবে এমন পথ ও মত যার মধ্যে তাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর তাদের এই পছন্দকরণ ও স্বাধীনতা অনুশীলনের পর তারা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে এই পছন্দকরণের বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা সম্পর্কে। সুতরাং আবশ্যক হলো এমন বিষয় পছন্দ করা যাতে প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে যার মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত তথা দোজাহানের মুক্তি ও সফলতা নিশ্চিত করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা নাজাত তথা মুক্তির পথকে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন, আর তা হলো নবী ও রাসূলগণের রিসালাতের অনুসরণ করা; তিনি বলেন :

﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾﴾ [البقرة: ٢١٣]

"সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে প্রেরণ করেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেন যাতে তিনি মানুষেরা যে সব বিষয়ে মতভেদ করতো সেসবের মীমাংসা করতে পারেন। আর যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিল স্পষ্ট নিদর্শন তাদের কাছে আসার পরেও শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ সে বিষয়ে তারা বিরোধিতা করতো। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছাক্রমে ঈমানদারদেরকে হেদায়াত করেছেন সে সত্য বিষয়ে যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে সরল পথের দিকে হেদায়াত করেন।" (সূরা আল-বাকারা: ২১৩)।

এই আয়াত থেকে বলা যায় যে, যুদ্ধের ময়দানে যে ব্যক্তি আক্রমণ করে অথবা যে ব্যক্তি আক্রমণকারীদেরকে মতামত দিয়ে অথবা পরিচালনার মাধ্যমে অথবা পরিকল্পনার দ্বারা সহযোগিতা করে তার সাথে ছাড়া অন্য কারও সাথে লড়াই করা যাবে না; আর যুদ্ধ তো শুধু আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ, যুলুম থেকে বাধা প্রদান এবং শত্রুদেরকে প্রতিরোধ করার জন্যই; আর কোনো ব্যক্তির অঙ্গ-বিকৃতি করা বৈধ হবে না। আর কোনো প্রকার অত্যাবশ্যকতা ও শত্রুদেরকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্য ব্যতীত কাউকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখা, শাস্তি দেয়া ও দুর্ব্যবহার করা, লুণ্ঠন ও ছিনতাই করা এবং মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধের উপর আক্রমণ করা সঠিক হবে না।

দ্বিতীয়ত : মানুষকে মর্যাদা দান ও মানবাধিকার সংরক্ষণ

মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল-কুরআনুল কারীম নিখুঁত মূলনীতি প্রণয়ন করেছে। তা হলো মানুষকে সম্মান ও মর্যাদা দানের বাধ্যবাধকতা আরোপ, তার অস্তিত্ব রক্ষা করা এবং যে কোনো উপায়ে তার অধিকার সংরক্ষণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿۞وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا ٧٠﴾ [الاسراء: ٧٠]

"আর আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; আর স্থলে ও সমুদ্রে এদের চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি; আর তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর ওদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" (সূরা আল-ইসরা: ৭০)।

যে মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাকে তার অধিকার এবং তার তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়পরায়ণতা, পরামর্শ ও নৈতিক চরিত্র রক্ষার ব্যাপারে জীবনযাপনের স্থায়ী মূলনীতি দিয়েছেন। সেসব মূলনীতি রক্ষা করা এবং তার নির্দেশনার আলোকে প্রতিটি মানুষের সাথে পারস্পরিক আচার-আচরণ ও লেনদেন পরিচালনা করা সকল অবস্থায় একান্ত জরুরি। তা শান্তি ও যুদ্ধ অবস্থায়, বিভিন্ন প্রকার আচার-আচরণে ও লেনদেনে, আলাপ-আলোচনায় ও তর্ক-বিতর্কে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে এবং প্রত্যেক অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতিতে।

আল্লাহর শরী'য়ত ও তাঁর দ্বীন অনুযায়ী কোনো মানুষকে তার নিজের ধর্মের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা ও তাকে কষ্ট দেয়া বৈধ নয়। তেমনিভাবে তার ধর্ম পরিবর্তন করা কিংবা সে জন্য তার উপর চাপ প্রয়োগ করা যাবে না; তার সম্মানহানি করা যাবে না, তাকে এমন শাস্তি দেয়া যাবে না যা তার সম্মান ও মর্যাদার সীমা অতিক্রম করে, তার ইজ্জত-আব্রুর উপর আক্রমন করা যাবে না, তার লজ্জা-শরমে আঁচড় দেয়া যাবে না কিংবা এ উদ্দেশ্যে তার উপর প্রভাব খাটানো যাবে না। তার সাথে এমন কোনো বিষয় চর্চা করা যাবে না যা নৈতিকতা ও শিষ্টাচারের পরিপন্থি। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীগণ তাদের ধর্মের মূলনীতিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলবে আর এসব হলো মুসলিমগণের প্রাথমিক কাজ। কিন্তু আমরা অধিকৃত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও জোরপূর্বক দখলকৃত দেশে এবং বর্তমান দিনের যুদ্ধক্ষেত্রসমূহে তার বিপরীত অনুশীলন লক্ষ্য করছি যা রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতির পরিপন্থি এবং যা মানবিক মূল্যবোধ, শিষ্টাচার ও নৈতিকতা বিবর্জিত।

তৃতীয়ত : নৈতিকতা ও শিষ্টাচারের নীতিমালা অনুসরণ

চরিত্র হচ্ছে দ্বীনের আধার, সভ্যতার ভিত্তিমূল এবং আচার-ব্যবহারের বুনিয়াদ, আর একইভাবে মানবিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিয়মনীতি। সুতরাং কোনো মানুষ, কোনো জনগোষ্ঠী বা কোনো রাষ্ট্র এমন কোনো আচরণ করবে না যা নৈতিক মূল্যবোধ ও শিষ্টাচারের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হয়, বিশেষ করে যা মান-মর্যাদার মানদণ্ডের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হয়। ইসলামের এটিই বিধান। তার উপর ভিত্তি করেই বলা যায়, যতই ওযর বা কারণ থাকুক না কেন কোনো অবস্থাতেই কাউকে গোলাম বানানো, অপদস্থ করা, বল প্রয়োগ করা এবং জোরজবরদস্তি করা জায়েয নয়; আর বৈধ নয় মান-সম্মান ও মূল্যবান যথার্থ মূল্যবোধের পবিত্রতা নষ্ট করা। এমনকি শত্রু যদি এমন সমস্যার সৃষ্টি করে যা নিকৃষ্টতা, হীনতা অথবা সম্মানহানি বলে গণ্য হয় তাহলেও আমরা তার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করব না। কারণ মানুষের মান-সম্মান হলো পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর (অলঙ্ঘনীয়) বিধান বা সীমানা, যাকে লঙ্ঘন করা যাবে না এবং যাতে কোনো প্রকার আঁচড় দেয়া যাবে না, সে যে পর্যায়ের মানুষই হোক না কেন, অথবা তার জাত, দ্বীন (ধর্ম), আকিদা-বিশ্বাস ও মতবাদ যাই হোক না কেন। সুতরাং হারাম ও অবাধ্যতা উভয়টি মৌলিকভাবে হারাম ও অন্যায়, শত্রু ও বন্ধুর মধ্যে এ দুটির অবস্থা ভিন্ন নয়। ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর এক সেনাপতি সা'দ ইবন আবি ওক্কাস রা. - এর নিকট লিখিত এক চিঠিতে বলেন:

(آمرك ومن معك أن تكون أشد احتراسًا من المعاصي من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينتصر المسلمون لمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا قوة بهم؛ لأن عددنا ليس كعددهم، ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا ... ولا تقولوا : إن عدونا شر منَّا فلن يسلط علينا وإن أسأنا، فرُبَّ قوم سلط عليهم من هو شرٌّ منهم).

"আমি তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা তোমাদের শত্রুদের থেকে সতর্ক থাকার চেয়েও তোমাদের নিজেদের মধ্যকার অন্যায়-অপরাধের ব্যাপারে বেশি সতর্ক থাকবে। কারণ সেনাবাহিনীর অপরাধ তাদের জন্য তাদের শত্রুর চেয়েও ভয়াবহ; আর মুসলিমগণ তো শুধু তাদের

শত্রুগণ কর্তৃক আল্লাহর অবাধ্যতার কারণেই জয়লাভ করে থাকে। যদি এটা না হতো তাহলে তাদের বিপরীতে দাঁড়ানোর শক্তি আমাদের নেই। কারণ আমাদের সংখ্যা তাদের সংখ্যার মতো নয় আর আমাদের দল-বলও তাদের দল-বলের মতো নয়; সুতরাং অন্যায়-অপরাধের ক্ষেত্রে আমরা যদি সমান হয়ে যাই তাহলে আমাদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য সাব্যস্ত হবে। আর আমরা যদি আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদার দ্বারা তাদের উপর বিজয় লাভ করতে না পারি তাহলে আমরা আমাদের শক্তির বলে তাদেরকে পরাজিত করতে পারব না ... আর তোমরা বলো না: 'নিশ্চয় আমাদের শত্রু আমাদের থেকে নিকৃষ্ট, সুতরাং আমরা দুর্ব্যবহার করলেও তাকে কখনও আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না'; কারণ এমন অনেক জাতি আছে যাদের উপর তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।'[৪]

অপরাধের মারাত্মক ক্ষতি বর্ণনা করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাগরিক ও সভ্যতার নীতিমালা এবং যুদ্ধের মধ্যে পারস্পরিক আচার-ব্যবহারের মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন। তবে চরম প্রয়োজনের কারণেই তিনি তা করেছেন। আর খলিফা আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সংগৃহীত অসীয়তের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁর সেনাপতি ইয়াযিদ ইবন আবি সুফিয়ানের উদ্দেশ্যে এর পুনরাবৃত্তি করেছেন। আর এই 'নস' বা ভাষ্যটি হলো আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু'র অসীয়ত (উপদেশ):

« وإني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة ، ولا صبيا ، ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعن شجرا مثمرا ، ولا تخربن عامرا ، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ، ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه - أو تغرقنه - ، ولا تغلل ، ولا تجبن ».

'আর আমি তোমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি: অবশ্যই তুমি হত্যা করবে না কোনো নারীকে, কোনো শিশুকে, কোনো বয়োবৃদ্ধ মানুষকে; আর কাটবে না কোনো ফলবান বৃক্ষ; আর কখনও ধ্বংস করবে না কোনো বসতিপূর্ণ অঞ্চল; আর খাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীরেকে কখনও যবাই করবে না কোনো ছাগল বা উট; আর অবশ্যই তুমি খেজুর গাছ আগুনে পুড়াবে না, কাটবে না - অথবা বলেছেন পানিতে ডুবাবে না- ; আর তুমি খেয়ানত[৫] করবে না এবং ভীরু বা

কাপুরুষ হবে না।'[৬] আর ওমর ইবন আবদিল আযীয র. তাঁর এক গভর্নরের নিকট চিঠি লিখেছেন: আমাদের নিকট তথ্য এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সৈন্যদল প্রেরণ করতেন তখন তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন:

« اغزوا باسم الله في سبيل الله ، تقاتلون من كفر بالله ، لا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليداً » . و قل ذلك لجيوشك و سراياك إن شاء الله ، و السلام عليك » .

'তোমরা আল্লাহর পথে আল্লাহর নামে যুদ্ধ করো, লড়াই করো ঐ ব্যক্তির সাথে যে আল্লাহকে অস্বীকার করে,[৭] তোমরা বাড়াবাড়ি করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, অঙ্গবিকৃতি করো না এবং শিশুকে হত্যা করো না।' তুমি এই কথাগুলো তোমার সৈন্যদেরকে ও প্রেরিত সৈন্যবাহিনীকে বলে দিবে ইনশাআল্লাহ, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।'[৮] এই অসীয়ত দুটি ও অনুরূপ অসীয়তে রয়েছে নির্দেশ ও নিষেধ। কোনো মুসলিমের জন্য তা লঙ্ঘন করা বা অতিক্রম করা বৈধ নয়; তবে কখনও কখনও নিছক যুদ্ধের আবশ্যকতায় তা করার প্রয়াজন পড়লে সেটা ভিন্ন কথা; যেমন সৈন্যবাহিনীর অগ্রযাত্রা বা শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রতিহত করণার্থে কোনো গাছ কর্তন করা বা প্রাচীর ধ্বংস করা। এখন আমাদের প্রয়োজন এই মহান ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা থেকে উদ্ভূত কর্মকাণ্ড এবং আজকের বিশ্বে অপ্রয়োজনে ও অযৌক্তিকভাবে যোদ্ধাগণ-কর্তৃক পরিচালিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা।

চতুর্থত : অধিকারসমূহ ও দায়িত্ব-কর্তব্যের ব্যাপারে ন্যায়বিচার ও সমতা

আচার-আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার হচ্ছে স্বভাবগত বা স্বাভাবিক অধিকার; আর তা সরকারী শাসনব্যবস্থার স্থিতি ও স্থায়িত্বের মূলভিত্তি। অপরদিকে যুলুম হচ্ছে নাগরিকতা ও সভ্যতা ধ্বংসের এবং শাসনব্যবস্থার অধঃপতনের আহ্বায়ক বা নিয়ামক শক্তি। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীর মাধ্যমে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ ... ﴾ [النحل: ٩٠]

“আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন ...” (সূরা আন-নাহল: ৯০); আর "العدل" (ন্যায়বিচার) শব্দের উপর "الإحسان" (সদ্ব্যবহার) শব্দকে সংযুক্ত করা হয়েছে ব্যক্তির অন্তরের জ্বালাকে নির্মূল করার জন্য এবং মানুষের আন্তরিকতা ও ভালবাসাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨ ﴾ [المائدة: ٨]

“হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা তাক্ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।” (সূরা আল-মায়িদা : ৮); আর হাদিসে কুদসী'র মধ্যে এসেছে :

« يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى , وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا ». (أخرجه مسلم)

‘হে আমার বান্দাগণ! নিশ্চয় আমি আমার নিজের উপর যুলুমকে হারাম করেছি, আর আমি তোমাদের মাঝেও তা হারাম করে দিয়েছি, সুতরাং তোমরা পরস্পর যুলুম করো না।’ (সহীহ মুসলিম)।

ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর অমর বাণীতে বলেছেন :

"متى استعبدتم الناس , وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟!"

‘কখন তোমরা মানুষকে গোলাম বানিয়ে ফেললে অথচ তাদেরকে তাদের মায়েরা মুক্ত স্বাধীন হিসেবে জন্ম দিয়েছেন?!’

অধিকার, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং পরস্পর বিচারকের নিকট মুকাদ্দমা পেশ করার ক্ষেত্রে সমতার অধিকারও একটি স্বাভাবিক অধিকার যা ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারের পরিপূরক ও ব্যাখ্যা। সুতরাং কোনো ব্যক্তির অন্যের উপর আলাদা কোনো বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই যদিও সে রাজা-বাদশা, বা ভিন্ন বিশেষ গোষ্ঠীর লোক হতে পারে।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

" الناس سواء كأسنان المشط" .

“মানুষ চিরুনির দাঁতের মতো সমান।”[৯]

অপর এক হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

" لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " . (أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه)

“যদি ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ চুরি করতো, তাহলে আমি তার হাত কেটে দিতাম।”[১০]

অপরাপর জনগোষ্ঠীর সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের একটি অভিনব দৃষ্টান্ত হলো: সমরখন্দবাসীদের একটি কাহিনী, তারা ওমর ইবন আবদিল আযীয র. - এর নিকট কুতাইবা কর্তৃক তাদের উপর যুলুম ও নির্যাতনের অভিযোগ উত্থাপন করে এবং বলে যে, তিনি কোনো প্রকার সতর্কবাণী ঘোষণা না করেই তাদের দেশ করায়ত্ব করেছে। ওমর তাঁর বিচারককে নির্দেশ দেন তাদের বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য। বিচারক ফয়সালা দিলেন যে, আরবদেরকে সে ভূখণ্ড (সমরখন্দ) থেকে বের হয়ে তাদের সেনানিবাসে ফিরে যেতে হবে যতক্ষণ না সেখানে একটি নতুন সন্ধি চুক্তি অথবা একটি শক্তির দ্বারা বিজয় না আসবে।

পঞ্চমত : শান্তিচুক্তি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অনুকম্পা প্রদর্শন

ইসলাম ও তার মূলনীতিমালার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি, একগুঁয়েমি এবং মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতার নীতি অবলম্বন করা ছাড়াই ক্ষমা, মার্জনা ও অনুকম্পার মাধ্যমে জটিল বিষয়সমূহের সমাধান করা। কারণ ইসলামী দা‘ওয়াতের স্বভাব-প্রকৃতি হচ্ছে যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বাণীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧ ﴾ [الانبياء: ١٠٧]

“আর আমি তো আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য শুধু রহমতরূপেই পাঠিয়েছি।” (সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭)। এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ, প্রাণীজগৎ, জিন, জড়জগৎ এবং প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য রহমতস্বরূপ। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশ বংশের একদল ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন যারা চরমভাবে তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল এবং তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন :

« لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ . اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ » .

"আজ তোমাদের উপর কোনো অভিযোগ নেই, যাও, তোমরা মুক্ত।"

প্রাচ্যবিদদের মধ্য থেকে আরনল্ড প্রমূখের মত সুবিচারক ব্যক্তিগণ এই দৃশ্যমান বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন। 'গোস্তাফ লূবোন' বলেছেন: "আরবদের চেয়ে এত বেশি ন্যায়পরায়ণ ও দয়াবান কোনো বিজেতাকে ইতিহাস চেনে না।"

ষষ্ঠত : অপর পক্ষ যতক্ষণ প্রতিশ্রুতি বলবৎ রাখবে ততক্ষণ প্রতিশ্রুতি পূরণ

এটা হলো বিশ্বস্ততা ও মান-সম্মানের মূল বীজস্বরূপ। ইসলাম সকল অবস্থায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও আমানতের খিয়ানত করাকে হারাম করে দিয়েছে। আল-কুরআনে বহু ভাষ্য এসেছে যেগুলো অঙ্গীকার, চুক্তি ও ওয়াদা পূরণ করাকে ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) করে দেয়; তন্মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ﴾ [المائدة: ١]

"হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।" (সূরা আল-মায়িদা: ১)। অনুরূপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী:

﴿ وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ ٱللَّهَ عَلَيۡكُمۡ كَفِيلًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ ٩١ ﴾ [النحل: ٩١]

"আর তোমরা আল্লাহ অঙ্গীকার পূরণ করো, যখন তোমরা পরস্পর অঙ্গীকার করে থাকো এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের যামিন করে শপথ পাকাপোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।" (সূরা আন-নাহল: ৯১)।

কোনো দুর্বল দল বা গোষ্ঠী-কর্তৃক মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা নিষিদ্ধ, যখন সেই আহ্বান চুক্তিবদ্ধ গোষ্ঠীকে আক্রমণ করার দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ... وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ ... ﴾

[الانفال: ٧٢]

" ... আর যদি তারা দ্বীন সম্বন্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তখন তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, তবে যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে নয়। ... " (সূরা আল-আনফাল: ৭২)।

সপ্তমত : সমান আচরণ, যতক্ষণ তা মর্যাদা ও নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়

যদিও এই মূলনীতিটি প্রাচীন তবুও ইসলাম অন্যদের সাথে মুসলিমদের আচার-ব্যবহারের প্রসঙ্গে শান্তি ও যুদ্ধ উভয় অবস্থায় সমানভাবে এই নীতিটিকে গ্রহণ করে নিয়েছে, যাতে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং ন্যায়ের ঝাণ্ডাকে সুদৃঢ় করা যায়; আর শত্রুও যাতে তার কর্মকাণ্ড ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করে। সুতরাং সেখানে যদি শিষ্টাচার ও নৈতিকতার মূলনীতিমালার লঙ্ঘন হয় তাহলে তা কার্যকর করা হবে না। তার দৃষ্টান্ত হলো, ইসলাম যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির শরীর বিকৃত করা অথবা নাক ও কান কেটে, ঠোঁট কেটে এবং পেট ফেঁড়ে দেহ-বিকৃতি ঘটানোকে বৈধ বলে অনুমোদন দেয় না, এমনকি শত্রুপক্ষ যদি এই ধরনের কাজ করে তবুও ইসলামের বিধান হলো, মুসলিমরা হীনতার ব্যাপারে তার সাথে একমত হবে না; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বোক্ত হাদিসের মধ্যে অঙ্গ-বিকৃতি করতে নিষেধ করেছেন এভাবে: (لا تمثلوا) "তোমরা অঙ্গবিকৃতি করো না।"

২. অন্যান্য রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান

আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার উৎপত্তির বিষয়টি যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের সাথে; অথবা "রাষ্ট্র সংঘের সকল সদস্যের মধ্যে সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে সমতা"-র মূলনীতির সাথে। এটি ইসলামী চিন্তা-দর্শনের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য মূলনীতি। রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি প্রদান করা হলে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে জীবনযাপন করতে সক্ষম হয় এবং তার নাগরিকদের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালনে সর্বোতভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে। সুতরাং কোনো রাষ্ট্রের অধিকার নেই

অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করা অথবা তাতে আগ্রাসন চালানো এবং তার শক্তি-সামর্থ্য ও সম্পদের উপর প্রভাব বিস্তার করা। কারণ তাহলে তা হবে একটি অপরিপূর্ণ ও অ-সার্বভৌম রাষ্ট্র। তেমনিভাবে তার অধিকার নেই অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই মূলনীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দলিল হলো: ইসলাম প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার মূলনীতি ঘোষণা করেছে এবং ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য জাতি ও গোষ্ঠীসমূহের সাথে শান্তির নীতি মেনে চলেছে, যেমনটি ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে সুস্পষ্টভাবে লিখিত রয়েছে।[১১]

রাষ্ট্র ও জাতিসমূহকে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে আল-কুরআন পরিষ্কার বক্তব্য পেশ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ .. وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِىَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ... ﴿٩٢﴾ ﴾ [النحل: ٩٢]

"আর তোমরা সেই নারীর মত হয়ো না যে তার সূতা মযবুত করে পাকানোর পর এর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। তোমাদের শপথ তোমরা তোমাদের পরস্পরকে প্রতারিত করার জন্য ব্যবহার করে থাকো, যাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হতে পার ...।" (সূরা আন-নাহল: ৯২)। এর অর্থ তোমরা সতর্ক হও এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ব্যাপারে ঐ আহাম্মক নারীর মত হয়ো না যে তার সূতা মযবুত ও সুদৃঢ়ভাবে পাকানোর পর এর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়; ফলে তা নষ্ট ও মুক্ত হয়ে যায়, যেমনটি পাকানোর পূর্বে ছিল। তোমাদের অবস্থা হলো তোমরা প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ব্যাপারে করা তোমাদের শপথ গুলোকে ব্যবহার করো অন্যদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য এবং তাদের সাথে প্রতারণা করার জন্য, তোমরা বাহ্যিকভাবে চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং ভেতরে ভেতরে তোমরা অন্যদের জন্য তা লঙ্ঘন করো এবং (চুক্তিবদ্ধদের ছেড়ে) অন্যদের দিকে (চুক্তি করার জন্য) ঝুঁকে পড়ো; এ কারণে যে (যাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছ) তারা খুব শক্তিশালী ও সম্পদশালী (ফলে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যাদের সাথে বর্তমানে তোমরা চুক্তিবদ্ধ আছো তাদের চেয়েও তোমাদের বেশি কাজে লাগবে মনে করে চুক্তিভঙ্গ করতে প্রবৃত্ত হতে পার); অথবা এই আশঙ্কায় যে, (চুক্তিভঙ্গ করে যাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছ সে) দলটি সংখ্যায় ভারি হবে, অস্ত্র-শস্ত্রের দিক দিয়েও খুব

শক্তিশালী হবে এবং অনেক সম্পদশালী হবে; (ফলে তোমরা তাদের দ্বারা বেশি উপকৃত হতে পারবে) এসব কোনো কারণই যেন মুসলিমদেরকে চুক্তিভঙ্গ করতে প্রবৃত্ত না করে সে বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরী। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই বাণী: ﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ﴾ হলো বহুসংখ্যক জাতি, জনগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে স্পষ্ট বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞপ্তি। আল্লাহর এই বাণী অপরাপর জাতি বা জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অথবা অন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে দুর্বল করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছে। সুতরাং এসব কাজ করার কোনো অধিকার মুসলিমগণের নেই। আর এটাই অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের অস্তিত্বের স্বীকৃতি সাব্যস্ত করছে, সেগুলোর কোনো ধরনের ধ্বংস প্রচেষ্টা কিংবা সেগুলোর সীমানাচিহ্ন অপসারণ করার চেষ্টার অনুমোদন ছাড়াই ।

৩. শান্তি, মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতিকে তুলে ধরা :

ইসলাম তার সকল পদক্ষেপের মধ্যে অন্যান্য জাতির সাথে শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণকর বিষয়ে পরস্পরের অংশিদারিত্বের স্বীকৃতি দান এবং মানবিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সম্মান করার মূলনীতির ভিত্তিতে সমাধান উদ্ভাবনে উৎসাহিত করে। কারণ প্রত্যেকটি মানুষ অস্তিত্ব লাভ করেছে আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছার মাধ্যমে; বিধায় শরী'য়ত সম্মত কারণ ব্যতীত কোনো মানুষকে হত্যা করা বৈধ নয়। তা না হলে এটা স্রষ্টার সৃষ্টির উপর সীমালংঘন হয়ে যায়।

একদল ফিকাহবিদ ঘোষণা করেছেন যে, অন্যদের সাথে মুসলিমগণের সম্পর্কের ব্যাপারে মূলনীতি (সাধারণ নিয়ম) হলো: শান্তি, যুদ্ধ নয়; কারণ আল্লাহ তা'আলা বহু আয়াতে এই প্রসঙ্গে বক্তব্য পেশ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨ ﴾ [البقرة: ٢٠٨]

"হে মুমিনগণ! তোমরা পুর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম (তথা শান্তিতে) প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা আল-বাকারা: ২০৮)।

﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا تَبۡتَغُونَ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ﴾ [النساء: ٩٤]

"আর কেউ তোমাদেরকে সালাম দিলে দুনিয়ার জীবনের সম্পদের আশায় তাকে বলো না, 'তুমি মুমিন নও।" (সূরা আন-নিসা: ৯৪)।

﴿ فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمۡ فَلَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ وَأَلۡقَوۡاْ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ سَبِيلٗا ٩٠ ﴾ [النساء: ٩٠]

"কাজেই তারা যদি তোমাদের কাছ থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন নি।" (সূরা আন-নিসা: ৯০)।

﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ ﴾ [الانفال: ٦١]

"আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ুন এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করুন।" (সূরা আল-আনফাল: ৬১)।

এ সব বিধানের উপর ভিত্তি করে উক্ত ফকীহগণ স্থির করেছেন যে, ইসলামে যুদ্ধের কারণ হলো, মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া, তাদেরকে আক্রমণ করা বা তাদের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা। কুফর অথবা ধর্মের ভিন্নতা যুদ্ধের কারণ নয়। দলিল হলো: যুদ্ধে সাধারণ নাগরিক বা বেসামরিক লোকদেরকে হত্যা করা বৈধ নয়; আরও বৈধ নয় 'দারুল ইসলামে' অমুসলিমগণের কোনো প্রকার বিরক্তি ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার জন্য নিরাপত্তামূলক চুক্তি সম্পাদনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা। কারণ ইসলাম অপরাপর জাতিসমূহের সাথে পারস্পরিক লেনদেন ও ব্যবসায়িক তৎপরতার দিগন্ত উন্মোচন করেছে যাতে করে মুসলিম ও অমুসলিমগণের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

ফকীহ ইবনুস সালাহ বলেন, মূলনীতি হলো কাফিরদেরকে বহাল রাখা ও তাদের অস্তিত মেনে নেওয়া; কেননা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে চান না এবং তিনি তাদেরকে হত্যা করার জন্য সৃষ্টি করেন নি; বরং তাদেরকে হত্যা করার বৈধতা দেয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে আকস্মিক ক্ষতির কোনো আশঙ্কা

দেখা দিলে। তবে হত্যার এই বৈধতাটি তাদের কুফরীর শাস্তিস্বরূপ নয়। কারণ দুনিয়ার আবাসটি শাস্তি দেয়ার আবাস নয় বরং শাস্তি হবে আখিরাতে ...। আর বিষয়টি যখন এই প্রকৃতির তখন এই কথা বলা বৈধ হবে না যে, নিশ্চয় হত্যা করাটাই তাদের ব্যাপারে মূলনীতি।[১২]

কোনো কোনো চিন্তাবিদ বলে থাকেন যে, অমুসলিমদের সাথে মুসলিমগণের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে যুদ্ধ, শান্তি বা সন্ধি নয়। বস্তুত অতীতে বাস্তব মন্দ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার কারণেই তারা এ ধরনের সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। তাছাড়া মুসলিম ও অমুসলিমগণের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধ লেগে থাকা এবং অব্যাহতভাবে আক্রমণ করার বাস্তবতা তাদেরকে তা বলতে বাধ্য করেছে। আবার কখনও কখনও একথা (মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুদ্ধই মূলনীতি) বলার পেছনে মূল বিষয় ছিল অমুসলিমদের মধ্যে যারা মুসলিমগণকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টনী দিয়ে রেখেছিল তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদের অভ্যন্তরীণ মানকে উন্নীতকরণ যাতে তারা অস্ত্রত্যাগ না করে এবং আরাম-আয়েশ - প্রিয় না হয়ে যায়, আর যাতে তারা সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে এবং শত্রুগণের সামনে অটল থাকার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি অনুভব করতে পারে। এর প্রমাণ হচ্ছে, বড় যুদ্ধসমূহ (গাযওয়াসমূহ)। নবীর যুগে আরবদের সাথে সংঘটিত এ ধরনের যুদ্ধের সংখ্যা হলো ২৭। তাতে মুসলিমগণ আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে তাতার বা মোগল জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমূহ পরিচালিত হয়েছিল পূর্ব অঞ্চলের মুসলিমদেশ সমূহে স্বেচ্ছাচারীদের আগ্রাসন বা লুঠপাটের কারণে। অনুরূপভাবে ইতোপূর্বে ক্রুসেডের যুদ্ধ ও অন্য যুদ্ধ সমূহেও আগ্রাসন প্রবণতার উপস্থিতির বিষয়টির ব্যতিক্রম হয়নি। এর পরে ইউরোপে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যেমন ত্রিশ বছরের যুদ্ধ, একশত বছরের যুদ্ধ, সম্রাটদের যুদ্ধ সমূহ, নেপোলিয়নের যুদ্ধ সমূহ ও ইউরোপের রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে শক্তির ভারসাম্যের যুদ্ধ সমূহ যেগুলো আগ্রাসন প্রবণতা থেকে মুক্ত ছিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ চলাকালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ইতিহাসে যদিও যুদ্ধপ্রবণতা প্রাচীন ও আধুনিক সবসময়েই একটি বাস্তব বিষয়, তবুও একটি বিষয় স্পষ্ট যে, তা একটি

আকস্মিক সংঘটিত ব্যতিক্রমী প্রবণতা, মৌলিক কোনো বিষয় নয়। আর এই ধারণার ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিমগণের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই। যুদ্ধের জন্য কতগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ থাকে। পরস্পর যুদ্ধরত দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার একটা সুস্পষ্ট প্রভাব থাকে। প্রত্যেক পক্ষ বা দল অপরকে শত্রু হিসেবে দেখে এবং তার পরাজয় কামনা করে, তার উপর বিজয় নিশ্চিত করতে চায়। বিজয় লাভ ও পরাজয় নিশ্চিতকরণের আকাঙ্খা প্রত্যেক পক্ষকে কিছু ভুল - ত্রুটিপূর্ণ কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। অধিকাংশ সময় তা হয় গুরুতর। সুতরাং যুদ্ধের প্রারম্ভিক, মাঝামাঝি ও শেষ পর্যায়ের দিক বিবেচনা করে কতগুলো জরুরি বিধান অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক। এগুলোই এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত চারটি ধারায় বর্ণিত হবে।

(ক) ইসলামী শরী'য়তে যুদ্ধ অনিবার্য অবস্থায় বৈধ

রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধ হচ্ছে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে সশস্ত্র শত্রুতাপূর্ণ অবস্থা। তদনুযায়ী সম্পর্ক নির্ধারিত হয় পরস্পর যুদ্ধরত ব্যক্তিদের মধ্যে, অনুরূপভাবে তাদের ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যেও। তা হয় বিভিন্ন রকম, নিত্যনতুন ও জটিল।[১৩] আরবি ভাষার মূল "الحرب" (আল-হারব), "الجهاد" (আল-জ্বিহাদ) ও "الغزو" (আল-গাযও) শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত। তা হলো শত্রুর সাথে লড়াই করা। ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রে "الجهاد" শব্দটির প্রয়োগ ব্যাপক। রাগিব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল কুরআন' গ্রন্থে বলেছেন: "الجهاد" ও "المجاهدة" মানে শত্রু প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ব্যাপক শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করা।

ইবনু 'আরাফাহ্? আল-মালিকী জ্বিহাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, এটি হলো আল্লাহ তা'আলার কালেমা তথা বাণীকে সমুন্নত করার জন্য অথবা মুসলিম-কর্তৃক সে বাণীকে (অন্যের কাছে) পেশ করার জন্য অথবা এ উদ্দেশ্যে মুসলিম-কর্তৃক কোনো যমীনে প্রবেশ করার জন্য মুসলিম-কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ নয় এমন কাফিরের সাথে লড়াই করা।[১৪] ইসলামে জিহাদকে বিধিসম্মত করা হয়েছে শত্রুতা-সীমালঙ্ঘন থেকে মুক্ত করার জন্য বাধ্যগত অবস্থা তথা অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় অবস্থার প্রেক্ষাপটে। চৌদ্দ বছর যাবত মূর্তিপূজক মুশরিকদের দেয়া কষ্ট সত্ত্বেও মুসলিমগণের ধৈর্যধারণ করার পর হিজরতের সময় থেকে বার মাসের মাথায় দ্বিতীয় হিজরীর শুরুতে তা শরী'য়তের অন্তর্ভুক্ত হয়। তার দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠]

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ'।" (সূরা আল-হাজ্জ: ৩৯ - ৪০)। আল্লাহর বাণী ﴿ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ﴾ [কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে] এবং ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ ﴾[তাদেরকে বহিস্কার করা হয়েছে] হলো জিহাদকে শরী'য়তের অন্তর্ভুক্ত করার হেতুর বিবরণ। মুসলিমগণ অন্যদের তথা মুশরিকগণের দ্বারা যুলুম-নির্যাতনের শিকার হওয়া এখানে প্রধান কারণ। এটি হচ্ছে যুদ্ধের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ সম্বলিত নাযিলকৃত সত্তরেরও বেশি আয়াতের পরে যুদ্ধের অনুমতি প্রদানকারী নাযিলকৃত প্রথম আয়াত যা হাকেম তাঁর 'মুসতাদরাক'-এর মধ্যে ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন।[১৫]

বিষয়টিকে সমর্থনকারী আরেকটি আয়াত হলো:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ ﴾ [البقرة: ٢١٦]

"তোমাদের উপর লড়াই করাকে লিখে দেয়া হয়েছে যদিও তোমাদের নিকট এটা অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ করো হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালবাসো হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।" (সূরা আল-বাকারা: ২১৬)। কিন্তু জিহাদ শরী'য়তের বিধিবদ্ধ হওয়ার জন্য ধর্মীয় কোনো বিশেষণ বা বৈশিষ্ট্য ছিল না অর্থাৎ ধর্মই হলো যুদ্ধের উদ্দীপক অথবা এর উদ্দেশ্য হলো অন্যদের প্রতি বলপ্রয়োগ করা এবং তাদেরকে ইসলামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া, এমন কোনো ব্যাপার ছিল না; বরং জিহাদ ছিল যুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য, দুর্বলদেরকে সাহায্য করার জন্য এবং আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য।

'আরনল্ড' বলেন, এটা নিশ্চিত যে, এই বিশাল বিজয়সমূহ আরব সাম্রাজ্যের যে ভিত রচনা করেছিল; তা ইসলাম প্রচার-প্রসারের পথে সংঘটিত ধর্মীয় যুদ্ধের

ফল ছিল না বরং তাকে অনুসরণ করেছে খ্রিষ্টান ধর্ম থেকে খ্রিষ্টানদের ব্যাপকভাবে স্বধর্মত্যাগের আন্দোলন। শেষ পর্যন্ত এই স্থায়ী ধারণার জন্ম হয় যে, এই ধর্ম পরিবর্তনকেই আরবগণ লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে, যদিও এখান থেকেই খ্রিষ্টানগণ তরবারীকে ইসলামী দাও'য়াতের নিয়ামক শক্তি হিসেবে দেখতে শুরু করে।[১৬]

আরনল্ডের এই বক্তব্য 'ইসলাম তরবারীর জোরে সম্প্রসারিত হয়নি' -এই কথার অকাট্য দলিল। এটি আরও প্রমাণ করে যে, কলা-কৌশল ও উপদেশের মাধ্যমে ইসলামী দা'ওয়াত সম্প্রসারণ করা এবং শত্রুতাকে প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ করার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এ থেকে আরও পরিষ্কার হয় যে, দ্বীনে ইসলামে প্রবেশের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করার ঘটনা ইসলামী দা'ওয়াতের ইতিহাসে ঘটেনি। বিষয়টিকে আরও সুদৃঢ় করে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী:

﴿ لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]

"দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে।" (সূরা আল-বাকারা: ২৫৬)।[১৭]

(খ) শরী'য়তের দৃষ্টিতে যুদ্ধের শর্তসমূহ :

ইসলাম যুদ্ধকে তার জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অথবা বিরোধ মীমাংসার মাধ্যম হিসেবে অথবা ক্ষমতার প্রাণশক্তি পূরণ করার জন্য অথবা গণীমতের মাল অর্জন করার জন্য স্বীকৃতি বা অনুমোদন দেয়নি। যুদ্ধকে শুধু তখনই বৈধ মনে করা হয় যখন সেখানে এমন প্রয়োজন দেখা দেয় যার আশ্রয় নেয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না, যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি। মুসলিমগণ যুদ্ধের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে না এবং মুসলিমগণের মধ্য থেকে কেউ রক্ত প্রবাহিত করার তৃষ্ণাও প্রকাশ করে না। এটি ইসলামের বিরুদ্ধে গোঁড়ামীকারীগণের ধারণার বিপরীত। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« لا تتمنوا لقاء العدو , واسألوا الله العافية , فإذا لقيتموهم فاثبتوا , وأكثروا ذكر الله » .

"তোমরা শত্রুর সাক্ষাৎ কামনা করোনা; আর আল্লাহর নিকট নিরাপত্তার আবেদন করো; অতঃপর তোমরা যখন (যুদ্ধ করতে বাধ্য হবে এবং) তাদের

মুখোমুখি হবে, তখন তোমরা অটল থাক এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করো।"

যুদ্ধ অথবা জিহাদের ঘোষণার পূর্বে জরুরি বিষয় হলো তিনটি বিষয়ের কোনো একটি গ্রহণের ব্যাপারে শত্রুকে স্বাধীনতা প্রদান করা: (১) ইসলাম গ্রহণ করা, যার অর্থই হচ্ছে শান্তিতে প্রবেশ করা। (২) মুসলিমগণের সাথে সন্ধি ও শান্তিচুক্তি সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া এবং (৩) যুদ্ধ, যখন শত্রু লড়াইয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করবে। এর মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি নেই; কারণ তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়ার ব্যাপারটি জোর-জবরদস্তির বিশেষণটিকে শরী'য়তসম্মত ও যুক্তিসঙ্গতভাবে খন্ডন করে দিয়েছে।

ইসলামী বিধান হলো, যখন যুদ্ধ সংঘটিত হবে তখন তা ইসলামের শরী'য়তের মধ্যে চারটি শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত হবে। এগুলো হলো:

এক: এমন ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ না করা যে ব্যক্তি কর্মকান্ডের দ্বারা অথবা সাহায্য- সহযোগিতার মাধ্যমে অথবা মতামত ও পরিকল্পনার মাধ্যমে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নয়।

দুই: সম্পদ নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা। তবে সেনাবাহিনী কর্তৃক কোনো সুরক্ষিত স্থানে যাওয়ার বাধ্যগত প্রয়োজনে তা নষ্ট করা অনুমোদিত। আবার যে সম্পদ সরাসরি যুদ্ধে শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাও প্রয়োজনে নষ্ট করা যায়, যেমন কেল্লা ও দুর্গ।

তিন: যুদ্ধ চলাকালে এবং যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর মানবিক ও মর্যাদাগত মূলনীতিগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

চার: যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধের নিরবচ্ছিন্নতা বা স্থায়িত্বকে যথাসম্ভব বাধাগ্রস্ত করার জন্য সাধারণ অথবা বিশেষ নিরাপত্তা দানের বিষয়টিকে বিধিবদ্ধ করা।

যুদ্ধের নিয়ম-পদ্ধতি আরও জানা যাবে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর রা. প্রমূখের উপদেশাবলী থেকে। সে উপদেশাবলীর সংখ্যা হলো দশ, যেগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে।

« لا تقتلن امرأة ، ولا صبيا ... إلخ » . [অবশ্যই তুমি নারী, শিশুকে ..... হত্যা করবে না] ।

তাছাড়া যুদ্ধের মূলনীতিসমূহের প্রকাশিত হওয়া এবং তাকে আইনি রীতিনীতির স্তরে উন্নিত করার ব্যাপারে দ্বীনী ও অন্যান্য শিক্ষার প্রভাব সুস্পষ্ট । সেগুলো হচ্ছে তিনটি, অত্যাবশ্যকীয় কারণ, ঘোড়দৌড় সংক্রান্ত কারণ ও মানবিক কারণ ।

ইসলামে যুদ্ধকে বিধিসম্মত করার অবস্থা তিনটি ।[১৮] এগুলো হলো:

প্রথমত : মুসলিমগণের জন্য এককভাবে অথবা দলগতভাবে ইসলামের আহ্বানকারীগণের উপর আক্রমণ করা অবস্থায়, অথবা দ্বীনের ক্ষেত্রে ফিতনা প্রতিরোধের জন্য, অথবা বাস্তবিকই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া অবস্থায় যুদ্ধ করা জায়েয । কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ... ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠]

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে ... ।" (সূরা আল-হাজ্জ: ৩৯) । আল্লাহ্ আরও বলেন :

﴿وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۚ ... ﴾ [البقرة: ١٩١]

"আর তাদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে, তোমরাও সে স্থান থেকে তাদেরকে বহিস্কার করবে । আর ফেতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর । ..." (সূরা আল-বাকারা: ১৯১) ।

দ্বিতীয়ত : এককভাবে অথবা দলগতভাবে নির্যাতিত ব্যক্তিকে সাহায্য করার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা অনুমোদিত; কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ ﴾ [النساء: ٧٥]

"আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহর পথে, অসহায় নরনারী এবং শিশুদের জন্য, যারা বলে, 'হে আমাদের রব! এ জনপদ, যার অধিবাসী যালিম তা, থেকে আমাদেরকে বের করে নিন; আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কাউকে অভিভাবক করুন এবং আপনার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের সহায় করুন।" (সূরা আন-নিসা: ৭৫)।

তৃতীয়ত : আত্মরক্ষা এবং দেশের প্রতি আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধ করা অনুমোদিত; কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন:

﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠﴾

[البقرة: ١٩٠]

"আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; কিন্তু সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘন কারীদেরকে ভালবাসেন না।" (সূরা আল-বাকারা: ১৯০)।

আল-কুরআনের কিছু কিছু আয়াতে যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে শুধু যুদ্ধ চলা অবস্থায়, যুদ্ধের সূচনা করার জন্য নয়। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাটা একটি জরুরি বিষয় যাতে শত্রুগণ মুসলিমদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে সাহস না পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ ... ﴾ [الانفال: ٦٠]

"আর তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য সাধ্যমত শক্তি প্রস্তুতি রাখো ...।" (সূরা আল-আনফাল: ৬০)।

ইবনু তাইমিয়্যা র. বলেন, "আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিত থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কাফিরদের মধ্য থেকে যার সাথেই তিনি সন্ধিচুক্তি করতেন তার সাথেই তিনি যুদ্ধ করতেন না ... সুতরাং তিনি কাফিরদের কারোর সাথে আগ বাড়িয়ে যুদ্ধের সূচনা করেননি। আল্লাহ যদি তাঁকে প্রতিটি কাফিরকে হত্যা করার নির্দেশ দিতেন তাহলে তিনি তাদেরকে হত্যা করা এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা শুরু করতেন।"[১৯]

সারকথা হলো, ইসলামে শরী'য়তসম্মত যুদ্ধ মানেই হলো ন্যায়ভিত্তিক যুদ্ধ; আর যুদ্ধ সেই ব্যক্তির সাথে যে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে। এটি ইবনু তাইমিয়্যা র. প্রমুখের মতো আলেমগণ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন।

যুদ্ধবন্দীদের সাথে ইসলাম কোমল আচরণের নির্দেশ দিয়েছে, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মধ্যে আছে:

« استوصوا بالأسارى خيرا ».

(যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ভাল আচরণ করার ব্যাপারে আমার অসিয়ত গ্রহণ কর) ।[১০] আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝٨﴾ [الانسان: ٨]

"আর তারা মহব্বত তথা আন্তরিকতাসহ অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দান করে।" (সূরা আল-ইনসান/আদ-দাহর:৮) । অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের পরিণতি হচ্ছে, তাদেরকে সাধারণভাবে মুক্তি দেয়া হয়, অর্থাৎ কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়াই তাদের প্রতি অনুগ্রহ বা অনুকম্পা প্রদর্শন করা হয়; আর না হয় মুক্তিপণ আদায় করার মাধ্যমে মুক্তি প্রদান করা হয়, যেখানে অর্থের বিনিময়ে অথবা যুদ্ধবন্দীর বিনিময়ে যুদ্ধবন্দীদের বিনিময় করা হয়। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে অসুস্থ ও আহতদেরকে চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে এবং নিহত ব্যক্তিদের সম্মান রক্ষার জন্য তাদেরকে দাফন করার মাধ্যমে দেখাশুনা করা ওয়াজিব ।

(গ) ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধের কারণ

ধর্মের ক্ষেত্রে ভিন্নতা অথবা অমুসলিমদের উপর ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস বাধ্যতামূলক করে দেয়ার চেষ্টা করা অথবা বর্ণবাদী বা শ্রেণীগত বা জাতিগত প্রভাব প্রতিষ্ঠা অথবা বস্তুগত বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধের কারণ নয়। ওমর ইবন আবদিল আযীয র. তাঁর এক গভর্নরকে, যিনি ইসলামের কারণে বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স (কর) জাতীয় রাজস্ব ঘাটতির অভিযোগ করেছেন তাকে, উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

" إن الله بعث محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق هاديا , و لم يبعثه جابيا " .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যসহকারে পথ প্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তাঁকে তিনি কর আদায়কারী হিসেবে প্রেরণ করেন নি।"

অধিকাংশ মুসলিম ফকীহ'র মতে যুদ্ধের কারণ হচ্ছে পরস্পরের মারামারি অথবা যুদ্ধবিগ্রহ অথবা সীমালঙ্ঘন বা আক্রমণ। সুতরাং কোনো মানুষকে শুধু তার ইসলাম বিরোধিতার কারণে হত্যা করা যাবে না, বরং তাকে হত্যা করা হবে তার আক্রমণ বা সীমালঙ্ঘনকে প্রতিরোধ করার জন্য। এর প্রমাণ হচ্ছে, ইসলামে বেসামরিক লোক অথবা যোদ্ধা নন এমন ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা এবং তাদের উপর আক্রমণ করা বৈধ নয়; কারণ তারা শান্তি প্রিয় অযোদ্ধা। আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী, শিশু ও সাধু-সন্ন্যাসীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া অমুসলিমগণ যখন চুক্তি অথবা শান্তি ও সন্ধির অঙ্গীকার সম্পাদন করতে চাইবে তখন তাদের আবেদনের প্রতি যথাযথ সাড়া দেওয়া হবে ইসলামসম্মত এবং তাদেরকে অন্য কিছুতে বাধ্য কিংবা জোর করা হবে না; কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا ... ٦١﴾ [الانفال: ٦١]

"আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন ...।" (সূরা আল-আনফাল: ৬১)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেছেন :

﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا﴾ [النساء: ٩٤]

"আর কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে তাকে বলো না, 'তুমি মুমিন নও'।" (সূরা আন-নিসা: ৯৪)।

ইতোপূর্বে যুদ্ধ করে না এমন কাউকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। আরেকটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হলো:

«انطلقوا باسم الله , وبالله , وعلى ملة رسول الله , لا تقتلوا شيخنا فانيا , ولا طفلا , ولا صغيرا , ولا امرأة , ولا تغلوا , وضموا غنائمكم , وأحسنوا ان الله يحب المحسنين» .

"তোমরা আল্লাহর নামে বের হও, আর আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; তোমরা অতি বৃদ্ধ মানুষকে হত্যা করো না, আর হত্যা করো না শিশু, কিশোর

ও নারীদেরকে; আর খিয়ানত করো না; তোমাদের গণীমতের মালসমূহ একত্রিত করো; আর তোমরা সদ্ব্যবহার করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীল দেরকে ভালবাসেন।"[২১]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা র. বলেন, "সুতরাং মুসলিমদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করার বৈধতা নির্ভর করে অন্যদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করার উপর।" তাঁর ছাত্র ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়া র. বলেন, "মুসলিমগণের জন্য যুদ্ধ করা ফরয ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না তার বিরুদ্ধে নয়।" আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠ ﴾
[البقرة: ١٩٠]

"আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; কিন্তু সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘন কারীদেরকে ভালবাসেন না।" (সূরা আল-বাকারা: ১৯০)।[২২]

(ঘ) ফিকহ শাস্ত্র কর্তৃক দুনিয়াকে দুটি বা তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করার তাৎপর্যের বর্ণনা

আইনবিদগণ জানেন যে, মুসলিম ফকীহগণ পৃথিবীকে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন, 'দারুল ইসলাম' (دار الإسلام) এবং 'দারুল হারব' (دار الحرب)। কিছুসংখ্যক ফকীহ'র মতানুসারে দুনিয়া তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত, এই দুটির সাথে সংযুক্ত অপরটি হলো 'দারুল 'আহদ' (دار العهد)।

'দারুল ইসলাম' (دار الإسلام): এটি এমন দেশ যাতে মুসলিমগণের ক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে এবং তাতে ইসলামের বিধিবিধানসমূহ চালু রয়েছে এবং তার বিশেষ নিদর্শনসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে; আর তার অধিবাসীগণ হলেন মুসলিমগণ ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ (কাফির) গোষ্ঠী।

'দারুল হারব' (دار الحرب): 'দারুল হারব' হচ্ছে ঐসব অঞ্চল বা দেশ যার অবস্থান ইসলামী নেতৃত্বের আওতার বাইরে হওয়ার কারণে ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে তাতে ইসলামের অনুশাসনের প্রয়োগ নেই; আর তার অধিবাসীগণ হলো সামরিক জনগোষ্ঠী।

'দারুল 'আহদ' (دار العهد) : 'দারুল 'আহদ' হচ্ছে ঐসব অঞ্চল যার সাথে মুসলিমগণের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয়ক শান্তিচুক্তি বিদ্যমান আছে অথবা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি বা দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধবিরতি বহাল রয়েছে। এর সাথে সংযুক্ত হবে নিরপেক্ষতা অবলম্বনকারীগণ; যেমন ইসলামের ইতিহাসে বর্ণিত হাবশা, নূবা ও সাইপ্রাসের অধিবাসীগণ।

বস্তুত এই বিভাজনের পিছনে কোনো নির্ভরযোগ্য শর'য়ী বক্তব্য নেই। বরং এ হলো মুসলিম ও অমুসলিমগণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের দাবানলের কারণে যা ঘটে তার বিবরণ। এটি আকস্মিভাবে সংঘটিত বাস্তব অবস্থা ও কাহিনীর বর্ণনা। এটি হলো পুরাপুরিভাবে তার অনুরূপ যা আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞগণ নির্ধারণ করেছেন দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বিদ্যমান অবস্থায় আন্তর্জাতিক পরিবারকে দুটি দলে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে। একটি হলো যুদ্ধরত ব্যক্তিদের দল এবং তা যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্রকে শামিল করে। অপর দলটি হলো বেসামরিক লোকজনের যারা নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছে এবং তা আন্তর্জাতিক বলয়ের বাকি সকল সদস্য রাষ্ট্রকে শামিল করে।

সঠিক কথা হলো, ইসলামী আইনশাস্ত্র, যা আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত তা, ইমাম শাফেয়ী র. - এর বর্ণনার মতো করে দুনিয়াকে একটি অঞ্চল[২৩] বলে আখ্যায়িত করেছে। সুতরাং যখন নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এবং শান্তির স্থলে যুদ্ধ নেমে আসবে তখন দুনিয়াতে দুটি অঞ্চল দেখা যাবে; একটি হবে শান্তিপূর্ণ অঞ্চল, আর অপরটি হবে যুদ্ধ-সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল।

কিছুসংখ্যক প্রাচ্যবিদের উল্লেখিত বক্তব্য, "দারুল হারব (دار الحرب) স্থায়ী-ভাবে দারুল ইসলাম (دار الإسلام)-এর সাথে শত্রুতাপূর্ণ অবস্থানে থাকবে" তা সঠিক নয়; কারণ শত্রুতা একটি অস্থায়ী জিনিস এবং যুদ্ধাঞ্চলসমূহের মধ্যে অথবা সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

* * *

১. "الأريسيين" বলতে কৃষক, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের মত সাধারণ জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়।

২. প্রফেসর ড. হামিদ সুলতান, আহকামুল কানুন আদ-দুয়ালী ফী আশ-শরী'য়া আল-ইসলামীয়া (أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية), পৃ. ১১৫

৩. শাইখ রশীদ রেদা, 'আল-ওহী আল-মুহাম্মাদী' (الوحي المحمدي), পৃ. ২২৮; আরও দেখুন, 'তাফসীরুল মানার' (تفسير المنار) : ১০/১৩৯-১৪৪; আমাদের সম্মানিত শিক্ষক মুহাম্মদ আবূ যাহরা-কর্তৃক লিখিত মুহাম্মদ ইবন হাসান আশ-শায়বানী'র 'আস-সিয়ারুল কাবীর' (السير الكبير) নামক গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ৪১-৫৩; গবেষক, 'আছারুল হারবি ফিল ফিকহিল ইসলামী' (آثار الحرب في الفقه الإسلامي). পৃ. ১৪১ - ১৪৭ ।

৪. জামাল 'আইয়াদ, নুযমুল হারব ফিল ইসলাম (نظم الحرب في الإسلام), পৃ. ৪৩ ।

৫. খেয়ানত (الغلول) হলো: গনীমত অথবা যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মাল থেকে আত্মসাত বা খেয়ানত করা ।

৬. ইমাম মালেক, আল-মুওয়াত্তা, ২/৬; তানওয়ীর"ল হাওয়ালিক শরহু 'আলা মুওয়াত্তা মালেক (تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك)।

৭. অর্থাৎ যে কুফরীর ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে এবং মুসলিমগণের উপর আক্রমণ করে ।

৮. ইমাম মালেক, তানওয়ীরুল হাওয়ালিক (تنوير الحوالك) , পৃ. ৭ ।

৯. হাদিসটি ইবনু আবি হাতিম আর-রাযী 'ফী 'এলালিল হাদিস' (في علل الحديث) -এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। তিনি ভিন্ন অন্যরা " الناس مستوون " [জনগণ সমান] শব্দের মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ।

১০. হাদিসটি ইমাম তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী র. বর্ণনা করেছেন ।

১১. প্রফেসর ড. হামিদ সুলতান, 'আহকামুল কানুন আদ-দাওলিয়্যী ফিশ্ শরী'য়াহ আল-ইসলামীয়্যা (أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية) পৃ. ১১৮

১২. ইবনুস সালাহ'র ফতোয়ার পাণ্ডুলিপি (مخطوط فتاوى ابن الصلاح), পাতা নং ২২৪ ।

১৩. প্রফেসর ড. হামিদ সুলতান, 'আহকামুল কানুন আদ-দাওলিয়্যী ফিশ্ শরী'য়াহ আল-ইসলামীয়্যা, (أحكام القانون الدولي في التريعة الإسلامية) পৃ. ২৪৫ ।

১৪. ইবনু রুশদ, 'আল-মুকাদ্দামাত আল-মুমাহ্হাদাত' (المقدمات الممهدات), ১/২৫৮; আল-খুরাশী (আল-আযহারের প্রথম শাইখ), 'ফাতহুল জলীল 'আলা মুখতাসারুল 'আল্লামা খলীল' (فتح الجليل على مختصر العلامة خليل), দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩/১০৭।

১৫. আবদুর রাজ্জাক ও ইবনুল মুনযির ইমাম যুহুরী র. থেকে তা বর্ণনা করেছেন, তাফসীরুল আলুসী (تفسير الألوسي), ১৭/১৬২

১৬. টয়েনবি, আরনোল্ড, আদ-দা'ওয়াহ্ ইলাল ইসলাম, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৭।

১৭. প্রফেসর ড. হামিদ সুলতান, 'আহকামুল কানুন আদ-দাওলিয়্যী ফিশ্ শরী'য়াহ আল-ইসলামিয়্যা (أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية), পৃ. ২৪৮।

১৮. গবেষক, আছারুল হারবি ফিল ফিকহিল ইসলামী (آثار الحرب في الفقه الإسلامي), পৃ. ৯৩-৯৪।

১৯. ইবনু তাইমিয়্যা, রিসালাতুল ক্বিতাল (رسالة القتال), পৃ. ১২৫।

২০. তাবরানী আবূ 'আযীয আল-জুমাহী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এটি হাসান হাদিস।

২১. ইমাম বায়হাকী র. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

২২. ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, ২/৫৮।

২৩. আদ-দাবূসী, তাসীসুন নযর (تأسيس النظر), পৃ. ৫৮।

ইমাম আওযা'য়ী র. এবং তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি

ড. আমের আয-যামালী

আরবি বহু প্রাচীন গ্রন্থে শামদেশের অধিবাসীদের ইমাম 'আবদুর রহমান আল-আওযা'য়ী'র -এর আলোচনা এসেছে। সেই গ্রন্থসমূহ থেকে আমরা উল্লেখ করছি ইবনু নাদীমের 'আল-ফিহরেস্ত' (الفهرست) এবং ইবনু আবি হাতিম আর-রাযী (মৃ. ৯৩৮)র 'আল-জারহ ওয়াত তা'দীল' (الجرح والتعديل) -এর কথা। আর আধুনিক গ্রন্থপঞ্জি থেকে আমরা ইঙ্গিত করছি প্রখ্যাত লেখক ডক্টর সুবহী মাহমাচানী'র লেখা 'আল-আওযা'য়ী ওয়া তা'আলীমিহিল ইনসানীয়া ওয়াল কানূনিয়্যাহ্?' (الأوزاعي و تعاليمه الإنسانية و القانونية) [বৈরুত ১৯৭৮] নামক গ্রন্থের দিকে।

আমরা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে ইমাম আওযা'য়ী র. -এর জীবনী এবং সীয়ার (যুদ্ধাবস্থার আইন) শাস্ত্রে উদ্ধৃতিসহ তাঁর অবদানের প্রতি বিশেষ ইঙ্গিতসহ শাসক ও শাসিতের সাথে সম্পৃক্ত তাঁর কতিপয় মতামত উপস্থাপন করব।

১. আওযা'য়ী র. : ব্যক্তি ও তাঁর সময়কাল

সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মতে আবূ ওমর আবদুর রহমান আল-আওযা'য়ী র. আনুমানিক ৮৮ হি./৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে বা'য়ালাবাক্কু শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য পূর্বাঞ্চলের শহরগুলোতে তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। ইয়ামামা, বসরা ও কুফার অনেক আলেমের নিকট তিনি হাদীস ও অন্যান্য জ্ঞানের বাণী শ্রবণ করেছেন। ইয়ামামা থেকে বসরার দিকে তাঁর সফরের শেষ ভাগে তিনি দামেস্কে আগমন করেন এবং বৈরুতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য সেখানেই তাঁর সফরের পরিসমাপ্তি ঘটান। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন এবং সেখানে আনুমানিক ১৫৭ হি./৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী ছিল ফিকহী মাযহাবসমূহের আত্মপ্রকাশ ও তার ক্রমবিকাশের সাক্ষ্যস্বরূপ। আর তা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃত রাজনৈতিক ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ঘটনা ছিল উমাইয়াদের নিকট থেকে আব্বাসীয়দের নিকট ক্ষমতা স্থানান্তরের ঘটনা। আওযা'য়ী র. সেই ঘটনাবহুল পরিবেশের মধ্যেই জীবনযাপন করেছেন এবং প্রশাসক (গভর্ণর) ও খলিফাদের সাথে তাঁর বহুবিধ যোগাযোগ ও বিস্তৃত সম্পর্ক ছিল।

সেসময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান নগরীসমূহের আলেমদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল তীব্র। কারণ প্রত্যেক নগরীর জন্য ছিল একাধিক ইমাম ও নেতা। সেসময় ইরাক ও হিজাযে দুটি ফিকহী মাদরাসার আত্মপ্রকাশ ঘটে, ইসলামী রাষ্ট্রের দিক-দিগন্তে যেগুলোর প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। মাদরাসা দুটির একটি হলো 'মাদরাসাতু আহলির রায়' বা সুচিন্তিত মত প্রকাশকারীদের মাদরাসা ইমাম আবূ হানিফা র. (৮০-১৫০ হি./৬৯৯-৭৬৭ খ্রি.) ছিলেন সেটার নেতৃত্বে। অপর মাদরাসাটি ছিল 'মাদরাসাতু আহলিল হাদিস' বা শুধু হাদিসের মতামতের উপর নির্ভরশীল মাদরাসা, আর তার নেতৃত্বে ছিলেন মদীনার ইমাম মালেক র. (৯৩-১৭৯ হি./৭১২-৭৯৫ খ্রি.)। ইমাম আওযা'য়ী র. তাঁদের দু'জনের কারও ছাত্র বা অনুসারী ছিলেন না বরং তিনি নিজেই ছিলেন একটি মাযহাবের সূচনাকারী এবং তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ফকীহগণের অন্যতম। এর প্রমাণ হচ্ছে শাম দেশে দু'শ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁর মাযহাবের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল এবং তা পশ্চিম আরব থেকে মুসলিম স্পেন পর্যন্ত বনু উমাইয়ার তৃতীয় খলিফা হেকাম ইবন হিশামের শাসনকাল পর্যন্ত (তাঁর খিলাফত: ১৮০-২০৭ হি./৭৯৬-৮২২ খ্রি.) সম্প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু দুই শতাব্দীরও অধিক কাল পরে শাম দেশে শাফেয়ী মাযহাব প্রভাবশালী হয়ে যায় এবং স্পেনে প্রভাবশালী হয় মালেকী মাযহাব। সে হিসেবে আওযা'য়ী র.-এর মাযহাব স্পেনের নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রায় চল্লিশ বছর। এ জন্য তাঁকে বিলুপ্ত মাযহাবের অধিকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। আর এসব কারণে আওযা'য়ী র. - এর যেসব গ্রন্থ আমাদের নিকট পৌঁছেছে তার সংখ্যা খুবই নগণ্য এবং সর্বোত্তম পরিস্থিতিতে অন্যদের রচিত গ্রন্থসমূহ তা অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। অনুরূপভাবে সে সময়ে তাঁর ছাত্রগণ তাঁদের শিক্ষকগণের ফিকহকে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দেননি, যেমনটি দিয়েছিলেন অপরাপর মাযহাবের অনুসারীগণ। তাছাড়া পরবর্তী বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকগণ অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে সম্মানিত

করেছেন। আওযা'য়ী র. - এর জীবনের বিভিন্ন পর্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করে জানা যায় যে, শাসক ও খলিফাগণের পক্ষ থেকে প্রস্তাব চাপিয়ে দেয়া সত্ত্বেও তিনি বিচারক ও মন্ত্রীর মতো সরকারী পদে ক্ষমতাসীন হননি, কিন্তু এটা শাসকের দায়িত্ব-কর্তব্য ও শাসিতদের অধিকারের প্রতি গুরুত্বারোপ করা থেকে তাঁকে বিরত রাখে নি।

২. আওযা'য়ী র. এবং শাসক ও শাসিতদের মধ্যকার সম্পর্ক

যেহেতু আওযা'য়ী র. ছিলেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের অন্যতম সেহেতু তিনি কথায় ও কাজে সুন্নাহ'র পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। আমরা তাঁর নিকট দুটি প্রভাবশালী অর্থবোধক শব্দ পাই যেগুলো তাঁর বহু উক্তির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। শব্দ দুটি হলো: " الراعي و الرعية " [দায়িত্বশীল এবং দায়িত্ব/যাদের উপর দায়িত্ব প্রাপ্ত]। আর এই শব্দ দুটি প্রসিদ্ধ হাদিসের শব্দাবলী থেকে নেয়া; হাদিসটি হলো:

«كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته »

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর তোমাদের প্রত্যেককেই দায়িত্ব/ তোমরা যাদের উপর দায়িত্ব প্রাপ্ত তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

তাছাড়া ইমাম আওযা'য়ী র.- কর্তৃক প্রশাসনিক দায়িত্বশীলদের নিকট প্রেরিত কিছুসংখ্যক পত্র, যেগুলো ইবনু আবি হাতিম আর-রাযী তাঁর 'আল-জারহ ওয়াত তা'দীল' (الجرح والتعديل) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন সেগুলো, সম্পর্কে জানাও এ বিষয়ে সহায়ক হবে। ইমাম আওযা'য়ী র. বিশ্বাস করতেন যে, আলেমের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, যখনই শাসককে জনগণের অবস্থাদি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে তখনই তাঁকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া; তার সামনে তার মতামত প্রকাশ করা এবং সাধারণ বিষয়াদির ব্যাপারে তার নিকট লেখালেখি করা। আমরা তাঁকে দেখি, তিনি উপকূলীয় এলাকার অধিবাসীদের জীবিকার বরাদ্ধ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে সুপারিশ করে খলিফার নিকট চিঠি প্রেরণ করেছিলেন এবং তাতে তিনি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'ঐসব লোকজন একান্তই আমীরুল মুমিনীনের প্রজা এবং তাঁকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে; কারণ তিনি হলেন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, আর প্রত্যেক দায়িত্বশীলকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।' তিনি ঐ

চিঠির মধ্যে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং তার কারণে অনেকের ঋণগ্রস্ত হয়ে পরিবারের ব্যয়ভার বহনের দুর্বিসহ অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। তিনি আরও ইঙ্গিত করেন যে, এ জন্য রাষ্ট্রের আবশ্যক হলো তাদের উপকারের জন্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণে) হস্তক্ষেপ করা। আবূ বালাজ নামক এক গভর্নরের নিকট পাঠানো চিঠিতে আওযা'য়ী র. যিম্মীদের পক্ষ সমর্থন করেছেন এবং তিনি তাকে হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফের নীতি অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« من ظلم معاهدا ، أو كلفه فوق طاقته ، فأنا حجيجه»

"যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোনো ব্যক্তির প্রতি যুলুম করবে অথবা তার উপর সামথ্যের অতিরিক্ত কোনো কাজ চাপিয়ে দেবে আমি তার বিপক্ষে অবস্থান নেব।" অনুরূপভাবে লেবাননের পাহাড়ী অঞ্চলের খ্রিষ্টানদের উপর যখন সাফ্ফাহ ও মানসুরের চাচা সালেহ ইবন 'আলী 'আব্বাসী অতিরিক্ত কর ধার্য করার মাধ্যমে অত্যাচার করেছিলেন, যার ফলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আর তিনি তাদের সে বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন, তখন ইমাম আওযা'য়ী র. তাদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন; এবং 'নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির অপরাধের কারণে অন্যদের ধরপাকড় করা'-এই নীতি মেনে নিতে পারেননি, বরং বলেছিলেন, 'যাদেরকে নিজ নিজ বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, তারা দাস নয়, তারা স্বাধীন, তারা 'আহলুয যিম্মাহ' বা এমন ব্যক্তিবর্গ যাদের রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব।'

আওযা'য়ী র. - এর পত্রগুলোর মধ্যে আমরা পদ অথবা বিশেষ সুবিধার মতো ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কোনো আবেদন দেখতে পাই না; বরং যার মধ্যে সর্বসাধারণের কল্যাণ রয়েছে তার জন্য চেষ্টাসাধনা করাকে তিনি তাঁর সার্বক্ষণিক দায়িত্ব বলে মনে করতেন। অথচ তিনি তাঁর যোগ্যতা দ্বারা সর্বোচ্চ স্তরে আসন করে নিতে পারতেন। যখন আমীর আবদুল্লাহ আব্বাসী তাঁর নিকট বিচারকার্য পরিচালনা করার দায়িত্ব পালনের প্রস্তাব করেন, তখন তিনি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক তা প্রত্যাখ্যান করেন এ কথা বলে যে, "আপনার পূর্ববর্তীগণ আমাকে এ ব্যাপারে কষ্টে নিক্ষেপ করেননি এবং নিশ্চয় আমি পছন্দ করব যে, তারা আমার প্রতি যে ইহসানের সূচনা করেছেন আপনি তা পরিপূর্ণ করবেন।"

ইমাম আওযা'য়ী র. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের ভেতরে ব্যাপক মঙ্গলজনক কাজের প্রতি গুরুত্বারোপের ব্যাপারে যতটুকু যত্নবান ছিলেন ততটুকুই তিনি বুঝতে পারতেন যে, রাষ্ট্রের স্তম্ভসমূহ সুদৃঢ় করণ এবং তার ক্ষমতাকে স্থায়ী করণের ক্ষেত্রে এর রয়েছে বিরাট ভূমিকা। আওযা'য়ী র. - এর সময়ে ইসলামী বিশ্বের সীমানা সম্প্রসারিত হয়েছিল পূর্ব দিকে পাঞ্জাব পর্যন্ত এবং পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত। সময়ে সময়ে বিভিন্ন মাত্রার ভয়াবহ অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দেখা দিত, যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আব্বাসীয়দের শাসনক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শক্তির জোরে এবং বাগদাদ হয়েছিল খিলাফতের রাজধানী যাকে খলিফা আল-মানসুর ১৪৫ হিজরীতে/৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে গড়ে তুলেছিলেন। এই অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা পুরাপুরিভাবে বন্ধ হয়ে যায়নি। আবার অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের অবস্থাও ভালো ছিল না। তখন বাইযেন্টাইনদের সাথে চলছিল নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ। এটিকে বিবেচনা করা হয় ফকীহগণ কর্তৃক শান্তি, যুদ্ধ ও উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিধিবিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করার মূল নিয়ামক শক্তিরূপে। এ বিধিবিধানের ব্যাপারে তারা 'সিয়ার' (السير) শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন; আধুনিক ভাষায় যা "আন্তর্জাতিক আইন" হিসেবে পরিচিত। এখন দেখা যাক এ শাস্ত্রে ইমাম আওযা'য়ী র. - এর অবদান।

৩. আওযা'য়ী র. ও সিয়ার

(ক) সাধারণ দৃষ্টি আকর্ষণী

'কিতাবুস সিয়ার' كتاب السير নামক গ্রন্থটি আওযা'য়ী র. - এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এবং তা ফিকহশাস্ত্র বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বড় ধরনের যুক্তিতর্কের সূচনা করেছে। গ্রন্থটির মূল পাঠের কোনো অস্তিত্ব নেই, বরং তা ইমাম আবূ হানিফা র. - এর ছাত্র কাযী আবূ ইউসূফ র. (১১৩-১৮২ হি./৭৩১-৭৯৮ খ্রি.) - এর 'আর-রাদ্দু 'আলা সিয়ারিল আওযা'য়ী' (الرد على سير الأوزاعي) নামক গ্রন্থের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম শাফেয়ী র. - এর 'আল-উম্মু' (الأم) নামক গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বাস্তব কথা হলো, যুদ্ধের বিধিবিধান সংকলনে হানাফী মাদরাসাটি ছিল সর্বাগ্রে, যার সূচনা হয়েছিল মুহাম্মদ ইবন হাসান আশ-শাইবানী (১৩২-১৮৯ হি./৭৪৮-৮০৪ খ্রি.) - এর দ্বারা। তিনি 'আস-সিয়ার

আস-সাগীর' (السير الصغير) নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। যখন আওযা'য়ী র. গ্রন্থটির ব্যাপারে অবহিত হলেন তখন বললেন, "এ গ্রন্থটি কার?", জবাবে তাঁকে বলা হলো: মুহাম্মদ (আশ-শাইবানী) আল-ইরাকী'র। তিনি বললেন, এ বিষয়ে ইরাকবাসীর কী লেখার রয়েছে? কারণ তাদের তো সিয়ার বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের যুদ্ধসমূহ হয়েছিল শাম ও হিজাযের দিকে, ইরাকের দিকে নয়; কেননা ইরাক জয় ছিল সবচেয়ে নতুন বিষয়। ('ইবনু কাছীর' র. থেকে সংগৃহীত)। আর তখনই ইমাম আওযা'য়ী র. তাঁর "সিয়ার" (السير) নামক গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু আশ-শাইবানীকে আওযা'য়ী র. - এর কথা সন্তুষ্ট করতে পারেনি; তাই তিনি "কিতাবুস সিয়ার আল-কাবীর" كتاب السير الكبير নামে আরেকটি গ্রন্থ লিখলেন। সম্ভবত এ গ্রন্থটি তিনি চিন্তাগত পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির পরবর্তী ধাপেই সম্পন্ন করেছিলেন এবং আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের নিকট তা প্রেরণ করেছিলেন, যার খিলাফত কালে আওযা'য়ী র. জীবিত ছিলেন না। সে যাই হোক, আওযা'য়ী র. ও তাঁর সমসাময়িক আলেমগণের মধ্যকার জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক থেকে পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে যে, আওযা'য়ী র. ফিকহ শাস্ত্রের প্রতিটি অধ্যায়ে হাদিস ও আছার তথা পূর্বসূরীদের মতামতের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। তিনি তাঁর কিতাব রচনার ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম যুগের কর্মকাণ্ডের শরণাপন্ন হতেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের যুগের প্রথম নীতিমালাকে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করতেন। বস্তুত ইসলামী সাম্রাজ্যের পূর্বে বর্ণিত বিস্তৃতি হয়েছিল পরবর্তীকালে। আওযা'য়ী র. - এর বর্ণনা অনুযায়ী ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধসমূহ হয়েছিল হিজায ও শাম অভিমুখী। আওযা'য়ীকে তাঁর 'সিয়ার' গ্রন্থ রচনায় সেই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে সে নীতিসমূহকেই পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে দেখা যায়। অন্যান্য মাদরাসার তুলনায় হানাফী মাদরাসাকে বিশেষ করে ইমাম আশ-শাইবানী'র পদ্ধতি অনুসরণে 'সীয়ার' শাস্ত্রের মূলভিত্তি স্থাপন করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। আবূ হানিফা র. ও তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্রগণ এবং মালেক র. এর সমসাময়িক ইমাম আওযা'য়ীও ফিকহ শাস্ত্রের শাখাসমূহের এই শাখাতে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাধারাসমূহ অবশিষ্ট ফকীহগণের চিন্তাদর্শনের সাথে তুলনামূলক তর্কবিতর্ক ও আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

আবূ ইউসূফ র. আওযা'য়ী র. - এর 'সীয়ার' গ্রন্থের যুক্তি খণ্ডনের ক্ষেত্রে তাঁর ওস্তাদ আবূ হানিফা র. ও আওযা'য়ী র. মধ্যকার মতপার্থক্যের কারণসমূহ পেশ করেছেন। তিনি এমন সব দলিলের উপস্থাপন করেছেন যার দ্বারা তাঁর শাইখ (ইমাম আবু হানিফা) এর মতটিকে শক্তিশালী করা যায়। তিনি তাঁর নিজের এমন মতও বর্ণনা করেছেন যা আবূ হানিফা র. -এর স্বীকৃত মতের কাছাকাছি। অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ী র. তাঁর 'আল-উম্ম' (الأم) গ্রন্থের মধ্যে আওযা'য়ী র. - এর 'সীয়ার' গ্রন্থের বক্তব্য সংরক্ষণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী র. তাঁর এ গ্রন্থে ইমাম আবূ হানিফা, আবূ ইউসূফ ও আওযা'য়ী র. - এর মতামতগুলো উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিজের মতটি ব্যক্ত করেছেন, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সেদিকেই যেতেন যেদিকে আওযা'য়ী র. তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন।

বৃহৎ সম্মানিত মাযহাবসমূহের তৃতীয়টির প্রধান ব্যক্তি ইমাম শাফেয়ী র. (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮২০খ্রি.) রায় (সুচিন্তিত মতামতপ্রদানকারী) ও হাদিস (শুধু হাদীসভিত্তিক মতামতপ্রদানকারী) এই দুপদ্ধতির মধ্যে মিশ্রণ ঘটিয়েছেন; তবে তিনি আওযা'য়ী র. - এর মতো অধিকাংশ সময় হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম তাবারী তাঁর 'ইখতিলাফুল ফুকাহা' (اختلاف الفقهاء) গ্রন্থে যুদ্ধের বিধিবিধানের সাথে সম্পর্কিত মাসআলাসমূহের ব্যাপারে ফকীহগণের মতামত এবং এ বিষয়ে তাদের মতৈক্য ও মতানৈক্যের স্থানসমূহ বর্ণনা করেছেন। সেখানেও তিনি ইমাম আওযা'য়ীর মতামতকে একজন পূর্ববর্তী বিদগ্ধ আলেমের মত হিসেবে পেশ করেছেন।

ইমাম আওযা'য়ী র. আলোচিত মাসআলাটি যাই হোক না কেন, সব ক্ষেত্রেই কার্যত ফিকহের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। 'সীয়ার' গ্রন্থে তিনি যুদ্ধের বিধিবিধানসমূহের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন; তা হলো শত্রু ও তার ধনসম্পদের বিষয়ে আচরণবিধি। আজ যখন আমরা দেখতে পাই যে, সশস্ত্র সংঘাতের আধুনিক নিয়মকানুনের এক বড় অংশ এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইমাম আওযা'য়ী র. - এর দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা। তিনি ঠিকই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, 'মানুষ যুদ্ধের ময়দানেও মানুষই থাকে, সুতরাং তাকে যুদ্ধ সামগ্রী হিসেবে বিবেচনার আগে মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করা দরকার'। এখানে ইমাম আওযা'য়ী র. - এর এই কিতাবের

সীমাবদ্ধতা দেখা যায়; কারণ তিনি গ্রন্থটিকে সীমাবদ্ধ করেছেন ইসলামী বিজয়ের ফলে সূত্রপাত ঘটেছে এমন নতুন কতগুলো বিষয়ের আলোচনা করার মধ্যে। সেখানে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্কের পরিপূর্ণ রূপরেখা প্রণয়ন করেননি।

ইমাম আওযা'য়ী র. - এর গ্রন্থটিতে যুদ্ধলব্ধ গণিমতের মাল, এ বিষয়ক বিধিবিধান, শত্রুপক্ষের নারী ও শিশুদের বন্দী করা, কাফের পুরুষ অথবা নারী যোদ্ধার ইসলাম গ্রহণের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রভাব এবং মুরতাদ (স্বধর্মত্যাগী), নিরাপত্তার আশ্রয়প্রার্থী, যুদ্ধবন্দী ও গুপ্তচরের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত বিষয়াবলী স্থান পেয়েছে।

যে যুগে আওযা'য়ী র. জীবন-যাপন করেছেন (খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী) আমরা যদি সে যুগের শত্রুপক্ষের লোকজন ও তার ধনসম্পদের সাথে আচার-ব্যবহার সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধের পরিমাণ এবং অনেক উদার নির্দেশনার অনুসরণের বিষয়টি স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

(খ) শত্রুপক্ষের লোকজন

* আওযা'য়ী র. মনে করেন যে, নারী অথবা শিশুকে হত্যা করা বৈধ হবে না যতক্ষণ না তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। আর তারা যদি যুদ্ধবন্দী হয়ে পড়ে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা যাবে না।

* প্রথম খলিফা আবূ বকর সিদ্দীক রা. (১১-১৩হি./৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)-কর্তৃক সেনাপতিদেরকে প্রদত্ত নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে আওযা'য়ী র. (যুদ্ধে) শ্রমিক, কৃষক, রাখাল, পাদ্রী ও অতি বৃদ্ধ মানুষকে হত্যা করার বিষয়টিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। এটি আবূ হানিফা র. ও তাঁর অনুসারীদের মতের অনুরূপ। এর আওতাভুক্ত হবে পাগল ও প্রতিবন্ধী লোকজন, যেমন অন্ধ ব্যক্তি।

* গুপ্তচরগণ মুসলিম অথবা যিম্মী অথবা শত্রু হওয়ার দিক বিবেচনা করে তাদের অবস্থান বিভিন্ন রকম হবে।

  - আওযা'য়ী র. কে মুসলিম গুপ্তচরের শাস্তির প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন, তাকে তাওবা করতে বলা হবে। অতঃপর সে যদি তাওবা করে তাহলে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে; আর যদি তাওবা করতে

অস্বীকার করে তাহলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেয়া হবে। আর এটাই হলো সাধারণভাবে ইমাম আবূ হানিফা ও শাফেয়ী র. - এর অভিমত। তাঁরা উভয়েই মুসলিম গুপ্তচরকে হত্যা করা বৈধ মনে করেন না।

- গুপ্তচর যখন এমন যিম্মী হয় যে শত্রুকে মুসলিমগণের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে অথবা শত্রুর গুপ্তচরদের আশ্রয় প্রদান করে তাহলে সে এর দ্বারা তার প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি ভঙ্গ করেছে বলে বিবেচিত হবে এবং সে তার (নিরাপত্তার) যিম্মাদারী থেকে বহির্ভূত গণ্য হবে ফলে শাসনকর্তার জন্য তাকে হত্যা করার অধিকার থাকবে। আর যদি সে (গুপ্তচর) সন্ধিচুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে সে মুসলিমগণের (নিরাপত্তা সংক্রান্ত) যিম্মাদারীর মধ্যে শামিল হবে না; নিম্নোক্ত আয়াতের উপর ভিত্তি করে তার সাথে কৃত সব চুক্তি তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡخَآئِنِينَ ٥٨﴾ [الانفال: ٥٨]

"নিশ্চয় আল্লাহ চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-আনফাল: ৫৮)। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী র. অভিমত পেশ করেন যে, তাকে হত্যা করা হবে না বরং তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে এবং তার সাথে কৃত অঙ্গিকার ছিন্ন করা হবে না। এটা ইমাম আবূ হানিফা র.-এরও অভিমত।

- যদি গুপ্তচর কোনো কাফের সশস্ত্র যোদ্ধা হয়, যে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য কোনোরূপ নিরাপত্তার সনদ ছাড়াই 'দারুল ইসলাম'-এ প্রবেশ করেছে, তাহলে তাকে মৃত্যুদন্ডের শাস্তি দেয়া হবে। অবশ্য ইমাম আবূ হানিফা র. - এর সাথে আরও যোগ করে বলেন যে, তারপর যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার ওপর থেকে এ শাস্তি প্রত্যাহার করা হবে। যদি সে ব্যবসা ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নিরাপত্তার গ্যারান্টি নিয়ে প্রবেশ করে এবং তার গুপ্তচরবৃত্তি প্রমাণিত হয় তাহলে শাসনকর্তার ওপর আবশ্যক হবে তাকে 'দারুল ইসলাম' থেকে বহিষ্কার করে 'দারুল হারব'-এর নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। যদি তার অনুপ্রবেশ ব্যবসার জন্য নিরাপত্তার গ্যারান্টি নিয়ে হয় এবং তার

গুপ্তচরবৃত্তি প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। তারপর তাকে 'দারুল হারবু' -এ নিরাপদ জায়গায় পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

আমরা যদি এ প্রাচীন ফিকহী গবেষণাগুলোর সাথে আধুনিক সময়ে প্রণীত শান্তি ও সংঘাত অবস্থায় গুপ্তচরের (গুপ্তচর রাষ্ট্রের প্রজাদের মধ্য থেকে হোক অথবা ভিন্ন রাষ্ট্রের অপরিচিত কেউ হোক) জন্য নির্ধারিত কঠোর বিধানসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা করি তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, পূর্ববর্তী মুসলিম ফকীহগণ যেসব সমাধান উদ্ভাবন করেছেন তা সহজ ও উদারতার গুণ ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। তারা শুধু সম্পূর্ণ সীমিত অবস্থাতেই কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন।

- আওযা'য়ী র. - এর অভিমত হলো, রাষ্ট্রপ্রধান নিম্নোক্ত সমাধানসমূহের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন: (১) যুদ্ধবন্দীর নিকট ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করা এবং তাকে হত্যা করা। (২) সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে মুসলিমগণের দাস হয়ে গেলে; তার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা এবং তাকে মুসলিম যুদ্ধবন্দীর বিনিময়ে বিনিময় করা। তার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণার জন্য মৌখিকভাবে "لا إله إلا الله" [আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই] বলাই যথেষ্ট। ধরে নেওয়া হয় যে, পরবর্তী সময়ে সে তার শিক্ষাটিকে পরিপূর্ণ করে নেবে। ইমাম শাফেয়ী র. এই অভিমত থেকে বেশি দূরে নন। তিনি মুসলিমগণের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার আবশ্যকতার ওপর জোর দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানিফা র. ও তাঁর কিছুসংখ্যক অনুসারীর মতে, রাষ্ট্রপ্রধান যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করা অথবা তাদেরকে দাস-দাসী বানানোর ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবেন। আর এক্ষেত্রে তাঁর উচিত হবে মুসলিমদের জন্য যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি মঙ্গলজনক সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। তিনি যদি হত্যা করার সিদ্ধান্ত দেন তাহলে এই সিদ্ধান্ত অতি বৃদ্ধ অথবা পঙ্গু অথবা অন্ধ অথবা আহত ব্যক্তি অথবা প্রতিবন্ধী, নারী ও শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তবে অধিকাংশ ফকীহ এবং ইমাম আবূ হানিফা র. - এর কিছুসংখ্যক অনুসারী রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতার বিষয়টিকে আরও ব্যাপক করার পক্ষে মত প্রদান করেছেন। জানা আবশ্যক যে, যুদ্ধবন্দীর জীবন মুসলিম যোদ্ধাদের

হাতে নয়। আওযা'য়ী র. অভিমত পেশ করেন যে, যুদ্ধবন্দীর হত্যাকারীকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং তার উপর রক্তপণ ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ আলেমের মতে, তার উপর রক্তপণ ওয়াজিব হবে না।

এখানে গুরুত্বসহকারে উল্লেখ্য যে, আল-কুরআনুল কারীমে এমন কোনো বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত হয়নি যা যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করা অথবা দাস বানানোর সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে। কোনো সন্দেহ নেই যে, ফকীহগণের সকলেই শত্রুর ভূখণ্ডে মুসলিম বন্দীগণ যেসব কঠোর আচরণের সম্মুখীন হতো তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না। বস্তুত অর্থ বিকৃতি ঘটানো, হত্যা করা এবং দাস-দাসী বানানো ছিল অষ্টম শতাব্দী ও তার আগে-পরের জাতিসমূহ ও জনগোষ্ঠীর নিকট প্রচলিত রীতিনীতি ও ঐতিহ্য। মুসলিম যুদ্ধবন্দীগণ হত্যা অথবা গোলামীর শিকার হওয়ার পূর্বে (শত্রুদের হাতে) মারাত্মক অমানবিক আচরণ ও বর্বরতার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও কোনো ফকীহই শত্রুপক্ষের যুদ্ধবন্দীদের সাথে দুর্ব্যবহার করার আহ্বান করেননি; বরং তাঁরা বন্দীদশার মধ্যে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, যেমনিভাবে তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যুদ্ধবন্দী শিশু ও তার মাতাকে পৃথক না করার ব্যাপারে।

আওযা'য়ী র. যুদ্ধবন্দীর অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত তাত্ত্বিক প্রশ্নগুলো খন্ডন করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি যুদ্ধবন্দীদের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ বিশেষ অবস্থারও মুখোমুখি হয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি খলিফা আল-মুনসুরের (৯৫-১৫৮ হি./৭১৩-৭৭৫খ্রি.) নিকট চিঠি লিখেছেন মুসলিম যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনার জন্য, যারা আরমেনিয়ার 'কালিকালা' নামক স্থানে রোমবাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছিলেন।

(গ) শত্রুর অর্থসম্পদ

* আওযা'য়ী র. - এর অন্যতম উক্তি হলো, "মুসলিমগণের জন্য এমন কোনো কাজ করা বৈধ নয় যা 'দারুল হারব' এর মধ্যে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনার দিকে নিয়ে যায়; কারণ এটা হলো এক ধরনের গোলযোগ তথা বিশৃঙ্খলা, আর

আল্লাহ্? বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাকে পছন্দ করেন না।" আর এটা শত্রুর সকল সম্পদকেই শামিল করে, যেমন গৃহপালিত পশু, গাছপালা, বসতবাড়ি ও উপাসনালয়। মুসলিম সৈন্যবাহিনীর অধিকার নেই যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার সীমা অতিক্রম করা। যুদ্ধের গণীমত মানে লুণ্ঠন করা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা নয় বরং তা আহরণ ও বণ্টন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বেশ কিছু নীতিমালার অধীন। সাধারণ অনুসরণযোগ্য নিয়ম হলো গণীমতের মালকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা; এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের জন্য এবং অবশিষ্ট চার ভাগ যোদ্ধাদের জন্য।

* ফকীহগণ নিম্নোক্ত আয়তটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে গণীমতের মাল আত্মসাৎ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন:

﴿وَمَن يَغۡلُلۡ يَأۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ﴾ [ال عمران: ١٦١]

"আর কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কেয়ামতের দিন সে তা সাথে নিয়ে আসবে" (সূরা আলে ইমরান: ১৬১)। যোদ্ধাদের জন্য গণীমতের মাল বণ্টন করার পূর্বে তা থেকে অংশবিশেষ গ্রহণ কর বৈধ হবে না। এই হুকুমের বাইরে থাকবে 'দারুল হারবে' অবস্থানকালে খাদ্য ও পশু খাদ্যের প্রয়োজনে তারা যা গ্রহণ করবে তা গ্রহণ করার বিষয়টি। আর আওযা'য়ী র. যোদ্ধার জন্য এমন বস্তু গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করেন যার তেমন কোনো মূল্য নেই। গণীমতের মাল আত্মসাৎকারী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে তার অংশ থেকে তাকে বঞ্চিত করা এবং তার সম্পত্তি জ্বালিয়ে দেয়ার মাধ্যমে; সে যা আত্মসাৎ করেছে তা ফেরত দেবে অথবা তাকে জরিমানা করা হবে। আমরা বিশেষ করে এই পয়েন্টে ইমাম আওযা'য়ীকে কঠোরতা অবলম্বনকারী হিসেবে দেখতে পাই যাতে গণীমতের কারণে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ব্যাপকভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়। লক্ষণীয় যে, ফকীহগণ গণীমতের মাল চুরির বিধান প্রণয়ন করেছেন যা সাধারণ চুরির নির্ধারিত শাস্তির চেয়ে ভিন্নতর। তারা গণীমতের মাল আত্মসাৎকারী ব্যক্তির উপর শাস্তি প্রয়োগের ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। আওযা'য়ী র. তার সম্পত্তি জ্বালিয়ে দেয়ার যে মত পেশ করেছেন ইমাম আবূ হানিফা, মালেক ও শাফেয়ী র. সেই মতকে সমর্থন করেননি।

যখন মুসলিমগণ এমন কোনো বস্তু ফেরৎ চাইবে যা শত্রুগণ তাদের কাছ থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং তার মালিক বণ্টনের পূর্বেই তা সনাক্ত করবে, তখন ফকীহগণের ঐক্যবদ্ধ রায়ের ভিত্তিতে সে তা গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু যদি গণীমতের মাল বন্টনের কাজ সমাপ্ত হয়ে যাবার পর তা চাওয়া হয় তাহলে সেটার বিনিময় পরিশোধ করা আবশ্যক হবে।

স্বভাবতই ফকীহগণ গণীমতের বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তার সাথে শত্রুর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বিধান বর্ণনার বিষয়টিকেও সংযুক্ত করেছেন। আওযা'য়ী র. ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম যাঁরা সর্বপ্রথম এর সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকটি মাসআলার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ফতোয়া দিয়েছেন।

৪. উপসংহার

শেষ পর্যায়ে আমরা বলতে পারি যে, ইমাম আওযা'য়ী র. ছিলেন হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর (খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর) শ্রেষ্ঠ ফকীহগণের অন্যতম। এই শতাব্দীর সূচনাকাল থেকেই তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের অগ্রগতির ধাপগুলো পর্যবেক্ষণ করেন এবং নিরপেক্ষ আলেমের অবস্থান গ্রহণ করেন। ফলে তিনি তাঁর নিকট প্রস্তাবিত কোনো সরকারী পদ গ্রহণ করেননি, চাই তা বনু উমাইয়ার শাসনামলে হোক অথবা বনু 'আব্বাসের শাসনামলে হোক; আর প্রস্তাবিত পদসমূহের মধ্যে বিচারকের পদ ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। ঠিক তেমনিভাবে তিনি প্রত্যেকটি মাসআলার ক্ষেত্রে হাদিস এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের আমলকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন। তিনি রাষ্ট্রের প্রজাদের অধিকার সংরক্ষণকারীর ভূমিকা পালন করতেন এবং ন্যায়বিচারের সহযোগিতা করা থেকে পিছিয়ে থাকতেন না।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আওযা'য়ী র. - এর অনেক ফতোয়া আমাদের নিকট সংকলিত অবস্থায় পৌঁছেনি। তাঁর ফিকহ সম্পর্কে যা জানা যায় তা তাঁর প্রচুর জ্ঞান ও ব্যাখ্যার শক্তিমত্তা প্রমাণ করে। কোনো সন্দেহ নেই যে, ইমাম আওযা'য়ী র. যা রেখে গেছেন তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো ছোট আকারের অথচ বড় উপকারী 'সিয়ার' সম্পর্কিত

কিতাব। 'সিয়ার' শাখাটি 'ফিকহ' শাস্ত্রের এমন শাখা-প্রশাখা সমূহের অন্তর্ভুক্ত যাতে অনেক আগেই যুদ্ধ এবং সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের বিষয়ে বিধিবিধান স্থান পেয়েছে। বস্তুত ইমাম আওযা'য়ী র. ও অন্য ফকীহগণের চিন্তাধারাসমূহ ইতিহাসের আওতার মধ্যে প্রতিস্থাপন করা জরুরি। তাছাড়া অন্য কোনো ফকীহ অথবা ইসলামী সেনাপতির প্রসঙ্গেও আলোচনা করা যায় যিনি তাঁর মানবিক নীতিসমূহের কারণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। কিন্তু আওযা'য়ী র. - কে সে কাঙ্খিত ব্যক্তি হিসেবে নির্বাচন করার জন্য পর্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান রয়েছে। কারণ তিনিই ফকীহগণের মধ্যে প্রথম প্রজন্মের সাথে সম্পর্কিত, আর তিনি যুদ্ধের নীতিমালার ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সর্বদা গভীর মানবিকতা ব্যক্ত করেছেন; যদিও তাঁর সামান্য কিছু পূর্বে হানাফীগণ 'সিয়ার' প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে লেবাননে প্রতিটি পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মাযলুমদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য আওযা'য়ী র. - এর বিশেষ অবদান ছিল।

আর ইমাম আওযা'য়ী র. - এর অবস্থান তাঁর দেশের কেন্দ্রস্থল বৈরুতে সদা-সর্বদা সর্বজনবিদিত ও সুপরিচিত, এমনকি আজকের এই দিন পর্যন্ত। সম্ভবত আজকের লেবাননবাসী অন্যদের চেয়ে তাঁর মতো লোকজনের প্রয়োজন খুব বেশি অনুভব করে।

* * *

ইসলাম এবং যুদ্ধবিষয়ক কার্যকলাপের প্রক্রিয়াগত কিছু মূলনীতি : প্রেক্ষিত আন্তর্জাতিক মানবিক আইন

ড. আমের আয-যামালী

ভূমিকা

সর্বজন বিদিত যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বর্তমান কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিমালার উপর; যা আবার তার চলার পথে বিস্তারিত শাখা-প্রশাখার দিকে মোড় নিয়েছে। এগুলোর মূল লক্ষ্য হলো যুদ্ধ বিষয়ক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে সশস্ত্র লড়াই দ্বারা সৃষ্ট ঐ সব ব্যক্তিদের ক্ষতি সীমিত করা যারা যুদ্ধে অংশ নেয় না বা অংশ নিতে অক্ষম। এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি আরও সম্প্রসারিত হয়ে ঐসব সম্পদকেও শামিল করে যা সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়নি। আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধানসমূহ তার ধারাসমূহের মধ্যে বর্ণিত দায়-দায়িত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে যুদ্ধরত পক্ষসমূহের উপর বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে এবং যুদ্ধের মধ্যে কতিপয় নির্দিষ্ট উপকরণ ও পদ্ধতির ব্যবহারকে শর্তযুক্ত অথবা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন যুদ্ধকে নিষেধ করে না, তবে আইনটি তার প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টায় তৎপর থাকে, মানবতার ঐসব প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে যেগুলোকে যুদ্ধের আবশ্যকতা উপেক্ষা করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে চারটি মূলনীতিকে গুরুত্বসহকারে অনুসরণ করা হয়; যথা (১) মানবতার সংরক্ষণ, (২) সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করার মূলনীতি, (৩) সামরিক লক্ষ্যবস্তু এবং বেসামরিক লোকজন ও সম্পদরাজির মধ্যে সাম্যের মূলনীতি, এবং (৪) যুদ্ধবিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সমতা। এই চারটি মূলনীতি উপস্থাপন করার মাধ্যমে এগুলোর সারকথা ও নির্দেশনার সাথে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও ইসলামের বিধি-বিধানের পরস্পর সম্পর্ক কী তা স্পষ্ট করে দেখা যেতে পারে।

এ সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক পর্যালোচনার বিষয়টি নিছক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং তা নির্ভর করে বেশ কিছু প্রায়োগিক উপাদানের উপর। কারণ শুধু বিধি-বিধানের কোনো মূল্য নেই যতক্ষণ না তা বাস্তবে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে না পারে।

১. মানবতা সংরক্ষণ

'মানবিক' আইন নিয়ে কথা বলতে হলে শব্দটির আসল তথা 'মানবতা' সংক্রান্ত আলোচনা না করে পারা যায় না। বস্তুত যুদ্ধ মানব সৃষ্ট একটি বাস্তব অবস্থা, কিন্তু তা মানবতার দাবিকে অস্বীকার করতে পারে না। আর আন্তর্জাতিক বিধিবিধান, প্রথাগত বিধান (Customary Law) অথবা লিখিত বিধান, তাকে সস্পষ্টভাবে সুদৃঢ় করে। কারণ সেগুলোর নির্দেশনা হচ্ছে, 'যুদ্ধে আক্রান্তদের সাথে মানবিক আচরণ করা' আবশ্যক। অর্থাৎ মানুষের মান-সম্মান, জীবন ও সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। ইসলামেরও মৌলিক নীতি হচ্ছে মানুষকে সম্মান করা, যেমন আল-কুরআনুল কারীমের মধ্যে এসেছে:

﴿ ۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٧٠ ﴾ [الاسراء: ٧٠]

"আর আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; আর স্থলে ও সমুদ্রে এদের চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি; আর তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর ওদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" (সূরা আল-ইসরা: ৭০)। এখানে "كرّم" ফে'ল বা ক্রিয়াটি আমাদের "الكرامة" তথা সম্মান শব্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই বাণীটিই মানবসত্ত্বাকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রণীত মৌলিক নীতিমালার আসল বিষয়, এমনকি যুদ্ধের মতো কঠিন সময়ের মধ্যেও। মানবতাকে সংরক্ষণের প্রয়োজনে আবশ্যক হলো, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না তাদেরকে যুদ্ধবিষয়ক কর্মকান্ডের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ধারণ না করা এবং তাদেরকেও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না করা যারা যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে অবস্থান করে। এই মূলনীতিটিকে সমর্থন করে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নির্ভর ইসলামী নিয়মনীতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠﴾ [البقرة: ١٩٠]

"আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; কিন্তু সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘন কারীদেরকে ভালবাসেন না।" (সূরা আল-বাকারা: ১৯০)। এর অর্থ হলো, যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে যুদ্ধরত দলের মধ্যে এবং সীমালংঘন করা থেকে নিষেধ করার দাবি হচ্ছে নির্ধারিত সীমানায় অবস্থান করা। আমরা জানি যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সনদ এর নিরাপত্তা নীতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর প্রতিরক্ষার জন্য নির্ধারিত আইন প্রণয়ন করেছে। এ জাতীয় প্রত্যেকটি চুক্তির উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের গন্তব্যস্থল একই; আর তা মানবিক আচার-ব্যবহারের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা ইসলামের ইতিহাসের সকল যুগে দেখতে পাই যে, ইসলামী সৈন্যবাহিনী তাদের সারিতে উদ্ধারকর্মী, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও বিচারকগণকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতো এবং তাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সহযোগিতা করতে যত্নবান থাকতো। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ থেকেই নারীগণ অসুস্থ ও আহতদেরকে সেবা করার দায়িত্ব পালন করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতদেহের অঙ্গ-বিকৃতি, আহতদেরকে হত্যা এবং যুদ্ধবন্দী ও নিরাপত্তা-প্রার্থীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের নীতি নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি মজবুতভাবে স্থাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যুদ্ধবন্দীকে খাবার দান করার বিষয়টি উল্লেখ করতে পারি, যা সুস্পষ্টভাবে আল-কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرًا ٨ ﴾ [الانسان: ٨]

"আর তারা মহববত তথা আন্তরিকতাসহ অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দান করে।" (সূরা আল-ইনসান/আদ-দাহর:৮)। হাদিস শরীফে আছে: «استوصوا بالأسارى خيرا» (যুদ্ধবন্দীদের প্রতি তোমরা ভাল আচরণ কর)।[১] এ বক্তব্যটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ভালো আচরণ করার বিষয়টি বন্দী জীবনের বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত সকল দিককেই অন্তর্ভুক্ত করে।

২. সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করার মূলনীতি

মানবিক আইনের সর্বাধুনিক চুক্তি হিসেবে আমরা ১৯৪৯ সালের জেনেভা চুক্তির সাথে সংযুক্ত ১ নং প্রটোকলের সিদ্ধান্ত সমূহের কথা উল্লেখ করব, যা ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত হয়। এর ৪৭ নং অনুচ্ছেদের বক্তব্য হলো: 'বিরোধের পক্ষসমূহ বেসামরিক ও সামরিক নাগরিকদের মধ্যে এবং বেসামরিক লক্ষ্যবস্তু ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে পার্থক্য করার ব্যাপারে কাজ করবে; আর তাই তাদের কর্মতৎপরতা পরিচালিত হবে সামরিক লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে, অন্য কিছুর বিরুদ্ধে নয়।" এই প্রথাগত আইনটিই হচ্ছে মূলত যুদ্ধের রীতি-নীতি ও তার ঐতিহ্যগত নীতির মূলভিত্তি। সুস্পষ্টভাবে তা রচনা করা এবং তাকে আন্তর্জাতিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা দ্বারা সশস্ত্র যুদ্ধের সর্বাবস্থায় সেটার প্রতি গুরুত্ব প্রদানের তাগিদ রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করব যে, 'অযোদ্ধা' গোষ্ঠী 'বেসামরিক' গোষ্ঠীর চেয়েও ব্যাপক। কারণ সশস্ত্র বাহিনীতে যোদ্ধা ছাড়াও চিকিৎসা সেবাদানকারী ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের মতো অযোদ্ধারাও সংশ্লিষ্ট থাকে।

একদিকে যোদ্ধা ও অযোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্যকরণের এ নীতি, অপরদিকে সামরিক লক্ষ্যবস্তু ও বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে পার্থক্য করার নিয়মনীতির প্রত্যাশা হলো, বেসামরিক ব্যক্তিদেরকে যুদ্ধবিষয়ক তৎপরতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না করা এবং যারা যুদ্ধ করতে অক্ষম হয়ে গেছে তাদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না করা; যেমন আহত, অসুস্থ, ডুবন্ত, যুদ্ধবন্দী এবং বিমান বিধ্বস্ত হবার পর প্যারাসুট নিয়ে নামা কোনো ব্যক্তি। তেমনিভাবে যুদ্ধবিষয়ক তৎপরতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা যাবে না চিকিৎসাসেবা ও ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকেও, তারা বেসামরিক বা সামরিক বাহিনীর সদস্য যা-ই হোক না কেন। আরও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা যাবে না দমকল বাহিনীর ব্রিগেডের ব্যক্তিবর্গ এবং আন্তর্জাতিক ও স্থানীয়ভাবে অনুমোদিত সাহায্য সংস্থাগুলোর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে। আর সুনির্দিষ্টভাবে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন যুদ্ধরত পক্ষ গুলোকে এমন সকল ব্যক্তি বা বস্তুকে লক্ষ্যবস্তু স্থির করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক করে দিয়েছে, যার কোন সামরিক লক্ষ্য নেই। এখানে বিশেষভাবে আরও উল্লেখযোগ্য হলো শারীরিক প্রতিবন্ধীগণ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য নির্মিত পারমাণবিক কেন্দ্রসমূহ, নাগরিকদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সম্পত্তিসমূহ, নিরাপদ অঞ্চলসমূহ, নিরপেক্ষ অঞ্চলসমূহ, নিরস্ত্রিকৃত এলাকা, সামরিকভাকে সংরক্ষিত নয় এমন

স্থানসমূহ এবং সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহ যাদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা বারণ। মানবিক আইন ব্যক্তি ও সম্পদ রক্ষার যে নির্দেশ দিচ্ছে তা ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ না নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যক্তি যুদ্ধসংক্রান্ত কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ করবে, আর যতক্ষণ না সে নিরাপদ ঘোষিত সম্পদ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে।

মানবিক আইন নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অনুরূপভাবে কোনো কোনো সম্পদ অথবা সংস্থার বিরুদ্ধেও সুনির্দিষ্ট কিছু স্থানে অনুরূপ প্রতিশোধমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা নিষেধ করে থাকে। কোনো ব্যক্তি বা সম্পদ বেসামরিক প্রকৃতির কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ জাগলে মানবিক আইন সেখানে তার বেসামরিক হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়। আর মানবিক আইন পার্থক্যহীনভাবে আক্রমণ করতে নিষেধ করে এবং যুদ্ধরত পক্ষসমূহকে আক্রমণের কাঙ্খিত লক্ষ্য নির্ধারণে আবশ্যকীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে বাধ্য করে।

বস্তুত এ গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যকরণ, যার দিকে আমরা ইঙ্গিত করেছি তা, ইসলামী শরী'য়তে মজবুত নীতিমালার মধ্যে গণ্য। ইসলামী শরী'য়ত সর্বাত্মক যুদ্ধকে স্বীকৃতি দেয় না, যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ রাখে সময়, স্থান ও লক্ষ্য মাত্রার নির্ধারিত গন্ডির মধ্যে। সাধারণ বিধান সম্বলিত কোরআনের আয়াতসমূহ, নির্দিষ্ট অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ, হাদিসে নববীসমূহ এবং খলিফাগণ ও সেনাপতিদের উপদেশসমূহের উপর নির্ভর করে ফকীহগণ এমন কিছু নিয়মনীতি ও আইন প্রণয়ন করেছেন যার মাধ্যমে তাঁরা যোদ্ধা ও অযোদ্ধাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। আমরা হাদিস শরীফের মাধ্যমে লক্ষ্য করি যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী, শিশু, শ্রমিক, অতি বৃদ্ধ ও গীর্জার পাদ্রীগণের মতো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। হিজরী দশম সনে (৬৩২ খ্রি.) সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের মধ্য থেকে প্রথম খলিফা আবূ বকর সিদ্দীক রা. যুদ্ধের মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন এভাবে: "হে মানবমণ্ডলী! তোমরা থামো, আমি তোমাদেরকে দশটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, সুতরাং তোমরা আমার পক্ষ থেকে তা সংরক্ষণ করো। তোমরা খিয়ানত করো না, আত্মসাৎ করো না; প্রতারণা করো না; অঙ্গবিকৃতি করো না; আর তোমরা ছোট্ট বাচ্চা, অতি বৃদ্ধ মানুষ ও নারীকে হত্যা করো না; আর খেজুর গাছ কেটো না এবং তা আগুনে পুড়াইও না; আর ফলবান বৃক্ষ নিধন করবে না

এবং খাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত ছাগল, গরু ও উট জবাই করো না; আর অচিরেই তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করবে, যারা নিজেদেরকে গীর্জার মধ্যে নিয়োজিত রাখবে, তাদেরকে তারা যাতে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে তাতে ছেড়ে দিও; আর অচিরেই তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট আগমন করবে যারা তোমাদের নিকট এমন কতগুলো পাত্র নিয়ে আসবে যাতে রং বেরংয়ের খাবার থাকবে, সুতরাং তোমরা যখন সেসব পাত্র থেকে খাবে তখন তোমরা তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে।"

অযোদ্ধাদের রক্ষা করার শর্তসমূহ এবং তাদের গন্ডির সীমানাকে প্রশস্ত অথবা সংকীর্ণ করার বিষয়কে কেন্দ্র করে ফকীহগণের মতবিরোধ সত্তেও ব্যক্তি ও সম্পদ রক্ষা সংক্রান্ত নীতিতে তারা সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অথবা তার মাঝে ও অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধসমূহে যদিও এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল যা থেকে বোঝা যায় যে, তাতে যোদ্ধা ও অযোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করার বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়নি, আর তাতে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল ছিনতাই, লুণ্ঠন, ধ্বংসযজ্ঞ ও বিনাশসাধন; তবুও এটা ইসলামী সেনাবাহিনীর কোনো স্বীকৃত চারিত্রিক নিয়মনীতি নয়। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইসলামী শরী'য়তের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ শুধুমাত্র ধ্বংসযজ্ঞ ও ভাংচুর করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত নির্মূলকরণ ও সম্পদরাশি ধ্বংসকরণের যুদ্ধসমূহকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না। এ ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হলো, যমীনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং সার্বিক গোলযোগকে সাধারণভাবে নিষিদ্ধ করা। সুতরাং যখন সামরিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে এবং প্রতিপক্ষের উপর বিজয় অর্জিত হবে, তখন এমন কোনো আক্রমণের প্রয়োজন নেই যার পেছনে কোনো লাভ নেই।

৩. ভারসাম্যতার মূলনীতি

যুদ্ধের সময়ে কিছু বোমা ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে 'সেন্টপিটার্সবার্গ ঘোষণা' (১৮৬৮) একটি মূলনীতি স্থির করেছে যার সারকথা হলো: 'যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রসমূহের একমাত্র বৈধ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শত্রুর সামরিক শক্তি দুর্বল করা।' তদানুসারে 'কোনো বাহিনী কর্তৃক যথাসম্ভব একটি বড় সংখ্যাকে বিপর্যস্ত করাই এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।" এ মূলনীতি পুরাপুরি লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে তখন যখন শত্রুতায় ব্যবহৃত হবে

এমন 'অস্ত্রশস্ত্র যা অন্যায়ভাবে ঐসব মানুষের দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করবে যারা যুদ্ধ করতে অক্ষম হয়ে গেছে বা যা তাদের মৃত্যুকে অনিবার্য করে তুলবে।' এ ধরণের অস্ত্র ব্যবহার 'মানবিক আইন' এর লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে, যেমনটি উল্লেখিত ঘোষণার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এ জন্যই "হেগ" চার্টার (স্থল যুদ্ধের নিয়মকানুন ও রীতিনীতি সম্পর্কিত ১৯০৭ সনের চতুর্থ হেগ চুক্তির সাথে সংযুক্ত) 'যেসব অস্ত্রশস্ত্র, বোমা-ক্ষেপনাস্ত্র ও পদার্থের ধর্ম হচ্ছে অতিরিক্ত দুঃখ-কষ্ট ঘটানো সেগুলোর ব্যবহার' নিষিদ্ধ বস্তুর মধ্যে গণ্য করেছে। ১৯৭৭ সালের প্রথম এডিশনাল জেনেভা প্রটোকল-১ (এপি-১) এর চেয়ে আরও বেশি অগ্রসর হয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সকল পক্ষকে এ নীতির আওতাধীন করেছে, শুধু যুদ্ধরত পক্ষকে নয়। বিষয়টিতে সেখানে এতই তাগিদ রয়েছে যে; নতুন অস্ত্র, যার গবেষণা কিংবা উন্নয়ন অথবা সংগ্রহ করা হচ্ছে, (জেনেভা চুক্তির) গৃহীত সিদ্ধান্তের দাবি অনুযায়ী অথবা আন্তর্জাতিক অন্য কোনো আইনের চাহিদা অনুযায়ী চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সকল পক্ষের কাছে সর্বাবস্থায় বা কোনো বিশেষ অবস্থায় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বলে স্বীকৃত হবে। এ তাগিদ ও দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত হওয়া শামিল করবে নতুন যে কোনো যুদ্ধাস্ত্র কিংবা যুদ্ধ-পদ্ধতির যাবতীয় নতুন পদ্ধতিকে।

এ প্রটোকল সেসব হামলাকে এলোপাথাড়ি আক্রমণের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করেছে যে হামলা থেকে ধারণা করা হয় যে এর দ্বারা বেসামরিক লোকদের জীবন নাশ হবে অথবা তাদের সমূহ ক্ষতি সাধিত হবে অথবা সাধারণ জনগণের ক্ষতিসাধন হবে অথবা এমন সম্ভাবনা থাকে যে এর দ্বারা ধ্বংসযজ্ঞ ও অনিষ্টতা উভয়টিই হতে পারে এবং অনুভবযোগ্য ও সরাসরি প্রত্যাশিত সামরিক লাভের তুলনায় অনেক বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আর আমরা যেমনটি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, বিপজ্জনক ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো স্থাপনাকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো যাবে না, যতক্ষণ না সেগুলো সরাসরি, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ও গুরুত্বসহকারে যুদ্ধবিষয়ক কর্মতৎপরতার পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং যখন এ পৃষ্ঠপোষকতাকে নির্মূল করার জন্য আক্রমন ছাড়া আর কোনো পথ খোলা না থাকে। সাধারণ নাগরিক, বেসামরিক লোকজন ও বেসামরিক অধিবাসীগণকে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধরত ব্যক্তিবর্গের যেসব সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, তন্মধ্যে অন্যতম হলো এমন হামলা পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকা, যা থেকে আশংকা হয়

যে তা বেসামরিক জনগণের সারিতে আকস্মিকভাবে মানবিক বিপর্যয় তথা ব্যাপক প্রাণসংহার ঘটাবে অথবা বেসামরিক অধিবাসীগণের ক্ষতিসাধন করবে, অথবা ধারণা করা যায় যে, এর দ্বারা ধ্বংসযজ্ঞ ও অনিষ্টতা উভয়টিই হতে পারে, আর তাতে ক্ষতির পরিমাণ এত অধিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যে তা অনুমিত ও সরাসরি প্রত্যাশিত সামরিক উপরকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অনুরূপভাবে আরও আবশ্যক হলো এ ধরনের যে কোনো হামলা বাতিল করা অথবা বন্ধ করা যে হামলার সুস্পষ্ট লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ অথবা যার লক্ষ্যবস্তু এমন যাদের ব্যাপারে বিশেষ নিরাপত্তার নির্দেশনা রয়েছে, অথবা যাদের উপর হামলা থেকে আশংকা করা হয় যে এর দ্বারা বেসামরিক লোকদের সারিতে মারাত্মক মানবিক বিপর্যয় তথা প্রাণ-সংহার ও সমূহ ক্ষতি হতে পারে, অথবা এ আক্রমণ সাধারণ অধিবাসীগণের ক্ষতি করতে পারে; অথবা আশংকা করা হয় যে, এর দ্বারা ধ্বংসযজ্ঞ ও অনিষ্টতা উভয়টিই হতে পারে; আর তাতে ক্ষতির পরিমাণ এত অধিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যে তা অনুমিত ও সরাসরি প্রত্যাশিত সামরিক উপকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এডিশনাল প্রটোকল-১ অনুযায়ী সীমালঙ্ঘন করে এলোপাথাড়ি আক্রমণ, যার বর্ণনা উপরে দেওয়া হয়েছে তা, যুদ্ধাপরাধ বলে গণ্য। অনুরূপভাবে বিপজ্জনক ক্ষমতাসম্পন্ন স্থাপনার উপর আক্রমণও যুদ্ধাপরাধ বলে গণ্য হবে।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন যুদ্ধের উপকরণসমূহের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছে। এডিশনাল প্রটোকল ১-এ এমন অস্ত্রশস্ত্র, বোমা বা ক্ষেপণাস্ত্র, পদার্থ ও যুদ্ধের পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যার প্রভাব থেকে সীমাহীন দুর্ভোগের উদ্ভব হয় (অনুচ্ছেদ ৩৫, উপ-অনুচ্ছেদ ২)। বস্তুত এ সব উপকরণ সামরিক প্রয়োজন বলতে যোদ্ধাগণ যা ব্যবহার করে থাকে তা তার নির্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করে যায়। আমরা যখন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার বিষয়ক নীতির দিকে দৃষ্টি দেব তখন আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করব যে, আন্তর্জাতিক আইন 'সেন্টপিটার্সবার্গ ঘোষণা'র সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট কতগুলো অস্ত্রকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শর্তারোপ করেছে; কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রের মতো কিছু অস্ত্রের ব্যবহার-সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়নে সমর্থ হয়নি। 'নিষিদ্ধকরণ' অথবা 'শর্তযুক্ত বা সীমিতকরণ' এই উভয়টির উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধের উপকরণসমূহের (ধ্বংসাত্মক) প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করা এবং সামরিক প্রয়োজনীয়তার সীমাকে অতিক্রম করতে বাধা প্রদান করা।

ইসলাম যেমনিভাবে তার শত্রুদের মোকাবেলার জন্য সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণের আবশ্যকতার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে তেমনি কঠোরভাবে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন করাকে নিষিদ্ধ করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ﴾ [الانفال: ٦٠] "তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য সাধ্যমত শক্তি প্রস্তুত রাখ" (সূরা আল-আনফাল: ৬০)। আয়াতটি যখন ব্যাপক, আর তা যখন জনবল, অস্ত্রশস্ত্র ও আভ্যন্তরীণ শক্তি অর্জনকে বোঝায়, তখন শত্রুকে প্রতিহত করার যাবতীয় উপাদানসহ পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় করার অর্থ এই নয় যে, বেআইনী ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে তা ব্যবহার করা যাবে।

যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আচার-আচরণের ভিত্তিতে ইসলামী ফিকহশাস্ত্র যুদ্ধের মধ্যে সংঘটিত পারিপার্শ্বিক এমন ক্ষতিসমূহের কথা অস্বীকার করেনি যা বেসামরিক লোকজন ও বেসামরিক প্রকৃতির সম্পদকে আক্রান্ত করে। ফকীহগণ অস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ও অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা যুদ্ধের আড়ালে যমীনের বুকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার বৈধতা দেননি। উদাহরণস্বরূপ, কেউ আবূ বকর সিদ্দীক রা. - এর অসীয়ত (উপদেশ) নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে দেখবেন যে, তাঁর উপদেশের সূচনা হয়েছে প্রতারণা, খিয়ানত ও গণীমতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়াকে নিষেধ করার মাধ্যমে। সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সম্মান দানের পাশাপাশি মুসলিমগণের প্রথম খলিফা গাছ-গাছালি ও পশু-পাখির প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এতে যুদ্ধের মধ্যেও পরিবেশ রক্ষার মূলনীতি রয়েছে। এ বিষয়টিই আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ১৯৭৭ সালের প্র এডিশনাল প্রটোকল ১-এ সংকলিত হয়েছে। মুসলিমগণের সর্বোচ্চ স্বার্থকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরা সত্ত্বেও ফকীহগণ মুসলিম সৈন্যবাহিনীর উপর কোনো প্রকার শর্ত ছাড়া অথবা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যা করা আবশ্যক হয় তার সীমা অতিক্রম করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বৈধতা দেন নি।

যেসব অস্ত্র প্রবীণ ফকীহগণের যুগে প্রসিদ্ধ ছিল সেসব অস্ত্র ও আধুনিক অস্ত্রের মধ্যে তুলনা করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা জানি যে, যুদ্ধের উপায়-উপকরণ ও কায়দা-কৌশলসমূহের ব্যবহার কতিপয় শর্তের অধীন ছিল এবং বিভিন্ন ইসলামী ফিকহশাস্ত্র বিষয়ক মাদরাসায় তা এখনও আলোচনা-সমালোচনার বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

৪. যুদ্ধের আবশ্যকতা

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ধারাসমূহের মধ্যে যুদ্ধের আবশ্যকতার বিষয়টি একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। উল্লেখিত "সেন্টপিটার্সবার্গ ঘোষণা"-'র ভূমিকার মধ্যে যা আছে তা আমাদেরকে ইঙ্গিত দেয় যে, "যুদ্ধের প্রয়োজনসমূহ মানবতার দাবিসমূহের সামনে বন্ধ করে দেয়া আবশ্যক"। তাছাড়া ১৯০৭ সালের চতুর্থ হেগ চুক্তির ভূমিকার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ (স্থল যুদ্ধের নিয়মকানুন ও রীতিনীতি) "মানবিক স্বার্থসমূহ"-এর ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে, আর একই চুক্তির ভূমিকার পঞ্চম অনুচ্ছেদ "সামরিক প্রয়োজনসমূহ যা অনুমোদন করে তা অনুযায়ী যুদ্ধের দুঃখ-কষ্টের সীমা নির্ধারণ করা" শীর্ষক বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছে। এ চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা কতিপয় নিষিদ্ধ বিষয়ের ব্যাপারে বক্তব্য প্রদান করে। তন্মধ্যে একটি নিষিদ্ধ বিষয় হলো, "শত্রুর সম্পদসমূহ ধ্বংস করা অথবা তার উপর আধিপত্য কায়েম করা, তবে যখন যুদ্ধের প্রয়োজন ধ্বংসকে অপরিহার্যভাবে আবশ্যক দাবি করবে (তখন তা নিষিদ্ধ নয়)।" জেনেভা চুক্তিসমূহের মধ্যে, বিশেষ করে এডিশনাল প্রটোকল ১-এর মধ্যে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ রয়েছে, যাতে "যুদ্ধের আবশ্যকতা" অথবা তার সমার্থবোধক "আবশ্যকীয় সামরিক চাহিদা" অথবা "আবশ্যকীয় সামরিক প্রয়োজন"-এর উল্লেখ রয়েছে। এডিশনাল প্রটোকল ২ (অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র যুদ্ধের শিকার লোকজনকে রক্ষা করা বিষয়ক) এর ১৭ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, "শক্তিশালী সামরিক কারণসমূহ"-ই কেবল অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র লড়াইয়ের সময়ে বেসামরিক নাগরিকদেরকে স্থানান্তর করার বিশেষ অনুমতি প্রদান করে। বস্তুত আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যাপকভাবে, অন্যায় পদ্ধতিতে ও অকারণে সম্পদরাজি ধ্বংস করা অথবা তার উপর আধিপত্য কায়েম করা অন্যতম যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য; যদি না সেটা সামরিক আবশ্যকতা হিসেবে প্রমাণ করা যায়।

ইসলামী আইন শাস্ত্রের মধ্যে আছে: "الضرورات تبيح المحظورات" [অত্যাবশ্যকতা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে অনুমোদনযোগ্য করে দেয়]। এটি সাধারণ মূলনীতিসমূহের মধ্যে একটি যা শান্তি ও সংঘাত সর্বাবস্থায় অনুসরণীয়। যেসব উদাহরণ নিয়ে ফকীহগণের আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে, শত্রু কর্তৃক নারী ও শিশুদের মতো অযোদ্ধাদেরকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আত্মরক্ষা করা অথবা কিছু সংখ্যক মুসলিমকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার

করে তার মাধ্যমে নিজেদেরকে রক্ষা করা। 'আবশ্যকতা'র এ মূলনীতিকে কাজে লাগিয়ে ফকীহগণ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাল গ্রহণকারী শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার বৈধতা দিয়েছেন। যদিও মানব-ঢালগুলো যুদ্ধের তৎপরতা বা অভিযানের মূল উদ্দেশ্য নয়। ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতিসমূহের মধ্যে জরুরি অবস্থাসমূহ নিয়ে কথা বলার সময় যে মূলনীতিটির দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয় সে মূলনীতিটি হলো: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" [কল্যাণ লাভ করার উপর গোলযোগ দূর করার বিষয়টি অগ্রগণ্য]। সুতরাং যখন তাৎক্ষণিক সামরিক স্বার্থের ক্ষতির পরিমাণ তার উপকারের চেয়ে বেশি হবে তখন সে জাতীয় সামরিক স্বার্থ অর্জনের চেষ্টা করা অবৈধ বলে গণ্য হবে। তাছাড়া জরুরি বিষয়টি তার মাত্রার দ্বারা নির্ধারিত হবে। সুতরাং যখন এমন কোনো জরুরি অবস্থার সৃষ্টি না হয়, যা শত্রুকে আক্রমণ করতে প্ররোচিত করে, তখন মুসলিমগণ আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঢাল গ্রহণ করার অবস্থায় যখন যোদ্ধাদের উপর নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন হয়ে যাবে তখন যারা ঐসব লোকদেরকে মানব ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের উপর আক্রমণ করার প্রয়োজন নেই।

ফকীহগণ যুদ্ধবিষয়ক প্রয়োজনীয়তার সাথে সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহ আলোচনা করার সময় শুধু "ব্যক্তিবর্গ"-এর উপর গুরুত্ব প্রদান করেননি, বরং যুদ্ধের উপকরণ ও পদ্ধতি সমূহকেও আলোচনা ও বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সামরিক স্বার্থের প্রতি সর্বোচ্চ মনোযোগ দেয়া সত্ত্বেও ফকীহগণ শত্রুর বিরুদ্ধে আগুন ও পানি ব্যবহার করা অথবা, উদাহরণস্বরূপ, রাতের আঁধারে আক্রমণ করাকে কেন্দ্র করে অনেক বেশি মতবিরোধ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে শত্রুর ব্যবহারের অনুরূপ আচরণের বিষয়টি আমাদের স্মরণ থেকে হারিয়ে গেলে চলবে না। আল-কুরআনের আয়াত ও সুস্পষ্ট হাদিস সমূহের উপর ভিত্তি করে ফকীহগণ যুদ্ধ চলাকালে শত্রুদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই মূলনীতি অনুসরণ করার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কিন্তু শত্রুর আচরণের অনুরূপ আচরণের বিষয়টি নির্ধারিত এক সীমায় এসে থেমে যাবে যা (কখনও) লংঘন করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে যখন বিষয়টি ইসলামে নিঃশর্তভাবে হারাম। এমনকি বিষয়টি যদি ঐসব অবস্থার মধ্যেও হয়, যা দাবি করে শত্রুকে এমন শাস্তি দেয়া যেরূপ শাস্তি মুসলিমগণকে তাদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে; তাহলেও আমরা দেখতে পাই, আল-কুরআন ঐসব (অবস্থায়) মুসলিমগণকে

আহ্বান করছে হিকমত (প্রজ্ঞা) ও ধীরস্থিরতা অবলম্বনের দিকে (নিষিদ্ধ আচরণের দিকে নয়)। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের বাণী হলো:

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ ١٢٦ ﴾ [النحل: ١٢٦]

"আর যদি তোমরা শাস্তি প্রদান করই তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই উত্তম।" (সূরা আন-নাহল: ১২৬)।

* * *

---

১. তাবরানী আবূ 'আযীয আল-জুমাহী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এটি হাসান হাদিস।

ইসলামী আইন ও মানব রচিত আইনে বেসামরিক নাগরিকদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা

ড. মুনির আত-তালাইলী

বিশ্ব ইতিহাসে দেখা যায়, যুগে যুগে যুদ্ধ ও সশস্ত্র লড়াইয়ের সময়ে মিলিয়ন মিলিয়ন বেসামরিক নাগরিকের মানুষের জীবনহানি ঘটেছে যদিও তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি অথবা যুদ্ধের দায়িত্বে থাকেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ও পরে ইউরোপে এমন সব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে যেগুলোতে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়। এগুলোতে যুদ্ধরত সৈনিকগণ মানবতার বিরুদ্ধে নানাবিধ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে এবং তারা বেসামরিক লোকদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত জনপদের নারী, শিশু ও বৃদ্ধগণ ছিলেন এমন সব লোকজনের অন্তর্ভুক্ত যাদের যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা বা অংশগ্রহণ ছিল না। এ বিষয়টি চিন্তাবিদ, ধর্মবিদ, জ্ঞানী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের হৃদয়কে বিচলিত করে তোলে এবং তাঁদেরকে যুদ্ধ চলার সময়ের জন্য অথবা কোনো দেশ দখল করার পরবর্তী সময়ের জন্য সেখানকার বেসামরিক নাগরিকদের সাথে আচার-ব্যবহারের নিয়মনীতি বা চুক্তি-অঙ্গীকার অথবা তাদের সাথে ব্যবহারের নতুন কায়দাকানুন খুঁজতে বাধ্য করে। এমতাবস্থায় বেসামরিক জনগণকে সুরক্ষা প্রদানের বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়।

প্রশ্ন হলো, ইসলামী আইনশাস্ত্র কি এ সমস্যার সমাধান আবিষ্কারে অবদান রাখতে সক্ষম? ফকীহগণ কি বিবাদমান পক্ষসমূহের মধ্যে যুদ্ধ পরিচালনার বিষয়ে কোনো নিয়মকানুন ও মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন? এসব যুদ্ধের মাঝে বেসামরিক নাগরিকদের প্রতিরক্ষার জন্য আইনকানুন প্রণয়ন করাই কি যথেষ্ট ? প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য নিম্নবর্ণিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

১. 'আল-হিমায়া' (الحماية) শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

'আল-হিমায়া' (الحماية) শব্দের আভিধানিক অর্থ: আল-হিমায়া (الحماية) শব্দটি যের যোগে " حَمَى الشيء يَحميه حِماية " থেকে নির্গত; যার অর্থ (i) مَنَعَه (সে তাকে বাধা দিয়েছে), (ii) " حمى المريض ما يضرّه : مَنَعَه إياه " (সে রোগীকে ক্ষতিকারক বস্তু ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে), (iii) " احتمى هو من ذلك و تحمّى : امتنع " (সে এর থেকে বিরত থেকেছে), অথবা (iv)" الحَميُّ : المريض الممنوع من الطعام والشراب " (এমন রোগী যাকে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছে)।[১] বলা হয়ে থাকে: "حَميتُ القوم حماية أي : نصرتهم " (আমি সম্প্রদায়কে সাহায্য করেছি)।[২] আবার বলা হয়ে থাকে: " حَميتُ المكان : مَنعتُه أن يقرب " (আমি তাকে জায়গার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছি) এবং " احتمى الرجل من كذا : أي اتقاه " (লোকটি এর থেকে আত্মরক্ষা করেছে)।[৩] আবার বলা হয়ে থাকে: " هذا شيء حَمِيّ أي : محظور لا يقرب " (এই বস্তুটি নিষিদ্ধ, যার নিকটবর্তী হওয়া যায় না); " حَمَيتُه حماية : إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه " (আমি তাকে রক্ষা করেছি যখন আমি আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করেছি এবং যে তার নিকটবর্তী হয়েছে তার থেকে তাকে বাধা প্রদান করেছি); " الحميم : القريب المشفق " (ঘনিষ্ঠ বন্ধু), আর তাকে 'হামীম' (حميم) নামে নামকরণ করা হয়েছে, কেননা সে তার সাথীকে রক্ষার জন্য ক্ষিপ্ত হয়, তারপর তাদেরকে প্রতিরোধ করে[৪], যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝١٠ ﴾ [المعارج: ١٠]

"এবং সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ নেবে না।"[৫]

সুতরাং আল-হিমায়া " الحماية " শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়:

- " المنع " (বাধা দেওয়া বা নিষেধ করা) এবং "النصرة" (সাহায্য করা); তবে 'আন-নুসরা' " النصرة "শব্দটি আল-মান'উ " المنع "শব্দের অধীনে এসে যায়; কারণ, সাহায্য করা মানেই সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষতি করা থেকে অন্যকে বাধা প্রদান করা।
- অনুরূপভাবে তা (الاتقاء) 'আত্মরক্ষা করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়; আর এটাও আল-মান'উ (المنع) শব্দের কাছাকাছি; কেননা যে ব্যক্তি

কোনো কিছু থেকে আত্মরক্ষা করে তার আত্মরক্ষা মানেই নিজেকে সে জিনিস থেকে বিরত রাখা ।

- আর 'আল-হিমায়া' (الحماية) শব্দটি "الدفاع" (প্রতিরোধ করা) অর্থেও ব্যবহৃত হয়; আর এটাও আল-মান'উ (المنع)শব্দের অধীনে শামিল হয়; কারণ কোনো বস্তুকে প্রতিরোধ করা মানেই তাকে সেই বস্তু থেকে বিরত রাখা যা তার ক্ষতি করে ।

সারকথা হলো: কোনো কিছুর হিমায়া (حماية) বা প্রতিরক্ষা মানেই বাধা দেওয়া বা বিরত রাখা [আল-মান'উ (المنع);] অর্থাৎ অনুরূপ কিছুকে তার নিকটবর্তী হওয়া থেকে বিরত রাখা; আর বিরত রাখাও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে ।

'আল - হিমায়া' (الحماية) শব্দের পারিভাষিক অর্থ: 'আল - হিমায়া' (الحماية) শব্দের পারিভাষিক অর্থ আভিধানিক অর্থ থেকে ভিন্ন নয় । বস্তুত 'আল- হিমায়া' (الحماية) শব্দটির মূল অর্থের মধ্যে আসলে কোনো বিভিন্নমুখিতা নেই; বরং তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের আলোকে তার প্রকার বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে । উদাহরণস্বরূপ রোগীকে রক্ষা করার মানে হলো খাদ্য বা পানীয় বা অন্য যা কিছু তার জন্য ক্ষতিকর তা থেকে তাকে বিরত রাখা; আবার উদাহরণস্বরূপ বেসামরিক নাগরিক প্রতিরক্ষার মানে হলো যে আক্রমণ তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে সেটিকে বাধা দেয়া ও তার পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করা । এই অর্থটি ইসলামী আইনশাস্ত্রে ও আন্তর্জাতিক আইনে সমানভাবে ব্যবহৃত ।

ইসলামী আইনশাস্ত্রে এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ফকীহগণের এই উক্তি:

(إذا عقد الهدنة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة)

"যখন অস্ত্রবিরতি (الهدنة)[৬] চুক্তি সম্পাদিত হবে তখন তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো মুসলিম ও যিম্মীদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করা ।"[৭] তাঁদের এ জাতীয় আরও উক্তি হলো:

(وجبت الدية على العاقلة؛ لأنهم أهل نصرته، فلما كانوا متناصرين في القتال والحماية، أُمروا بالتناصر والتعاون على تحمل الدية ليتساووا في حملها، كما تساووا في حماية بعضهم بعضاً عند القتال)

"আকেলা (হত্যাকারীর জ্ঞাতি-গোষ্ঠী) কর্তৃক দিয়্যত (রক্তপণ) দেয়া আবশ্যক হবে; কারণ 'আকেলা' হলো হত্যাকারীর সাহায্যকারী; সুতরাং তারা যখন যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী তখন তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে রক্তপণ পরিশোধের দায়িত্ব পালনে পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে; যাতে সে বোঝা বহনের ক্ষেত্রে তারা সমান সমান হতে পারে, যেমনিভাবে তারা যুদ্ধের সময় তাদের একে অপরকে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সমান।"[৮]

২. ইসলামী আইন ও আন্তর্জাতিক আইনে বেসামরিক নাগরিকগণ

আভিধানিক অর্থে বেসামরিক নাগরিক: আল-মাদানিউন (المدنيّون) শব্দটি মাদানী (مدني) শব্দের বহুবচন; তার মূল হলো 'মাদান' (مَدَن) এবং তার অর্থ হলো 'আকামা' (أقام) বা 'অবস্থান করেছে'। আর বলা হয়ে থাকে, 'মাদানা বিল মাকান' (مَدَن بالمكان) অর্থাৎ أقام به বা 'কোনো জায়গায় অবস্থান করেছে'। তার ক্রিয়ামূলের পরিমাপ হলো 'দাখালা' (دخل) এবং তার থেকে 'আল-মাদীনা' (المدينة) 'শহর' বা 'নগর' শব্দটি এসেছে, যা 'ফা'য়ীলা' (فعيلة) -এর ওজনে ব্যবহৃত এবং তার বহুবচন হলো 'মাদায়েন' (مدائن) (হামযাসহ), 'মুদনুন' (مُدْن) এবং 'মুদুন' (مُدُن)। 'আল-মাদীনা' (المدينة) হলো বিশেষ করে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহরের নাম। 'আল-মাদীনা (المدينة) এর সাথে সম্পর্কিত করে ব্যক্তি ও কাপড়কে (مَدَنِيّ) 'মাদানী' বলা হয় এবং পাখি ও অনুরূপ কোনো বস্তুকে 'মাদীনী' (مديني) বলা হয়। যখন কোনো ব্যক্তি মদীনায় আগমন করে তখন বলা হয় 'মাদানার রাজুলু' (مَدَن الرجل) 'লোকটি মদীনায় আগমন করল'।[৯]

(ক) ইসলামী আইনে বেসামরিক নাগরিকগণ

প্রাচীন ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণের পক্ষ থেকে 'আলমাদানিউন' (المدنيّون) পরিভাষাটি বর্ণিত হয়নি; বরং তাঁরা এ পরিভাষাটির কাছাকাছি অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন; যেমন 'গাইরিল মুকাতালা' (غير المقاتلة) বা 'অযোদ্ধা যারা'[১০]; অথবা 'মান লাইসা মিন আহলিল কিতাল' (من ليس من أهل القتال) বা 'যে ব্যক্তি যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'[১১]; অথবা 'মান লাইসা মিন আহলিল মুমানি'আতি ওয়াল-মুকাতিলিয়াতি' (من لم يكن من أهل المانعة والمقاتلة) বা 'যে ব্যক্তি প্রতিরোধকারী ও যোদ্ধাদের

অন্তর্ভুক্ত নয়'[১২]; অথবা 'মান লা ইয়াহিল্লু কাতলুহু মিনাল কাফারাতি' (من لا يحل قتله من الكفرة) বা 'কাফিরদের মধ্য থেকে যাকে হত্যা করা বৈধ নয়'[১৩]; অথবা 'মান লাম ইয়াকুন মিন আহলিল কিতালি মুবাশারাতান' (من لم يكن من أهل القتال مباشرة) বা 'যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'[১৪]; অথবা 'আল-মুহারিব' (المحارب) বা 'শত্রুপক্ষ', যেমনটি সমকালীন ফিকহের কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এই গুণটি কার উপর প্রযোজ্য হবে সে বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ফকীহগণ[১৫] এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। একদলের মতে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই বেসামরিক নাগরিক ['আল-মাদানী' (المدنيّ),] যে যুদ্ধ করে না। আর এর দৃষ্টান্তস্বরূপ তারা নারী, শিশু, অন্ধ ও ধর্মগুরুর কথা উল্লেখ করেছেন। এটি সুন্নী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ ও শিয়া যায়েদীয়া সম্প্রদায়ের অভিমত।[১৬] এ মতের পক্ষে সুনির্দিষ্ট ভাষ্য রয়েছে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ র.-এর। তাছাড়া এটি ইমাম শাফে'য়ী র.-এর দু'টি মতের একটি।

ফকীহগণের দ্বিতীয় দলের মতে বেসামরিক নাগরিক (المدنيّون) হচ্ছে শুধু নারী, শিশু ও দূতগণ। আর এটি হলো ইমামিয়্যা ও যাহেরিয়্যাদের মত। তাদের শীর্ষে রয়েছেন ইবনু হাযম[১৭]; [১৮]। আর তা শাফে'য়ীগণের[১৯] প্রসিদ্ধ মত। তাছাড়া এটি ইমাম ইবনুল মুনযিরেরও[২০] অভিমত[২১]। ইমাম শাফে'য়ী র. থেকে এক বর্ণনায় আছে যে, সন্ন্যাসী বা ধর্মগুরু বেসামরিক লোকের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন।[২২]

উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় দলের মধ্যে মতপার্থক্যের বিষয়টি জিহাদের মূল কারণের দিকে ইঙ্গিত করে। ইমামিয়্যা, যাহেরিয়্যা ও তাদের সমমনাগণ, যেহেতু তাদের নিকট হত্যা করার অনিবার্য কারণ হচ্ছে 'কুফরি', সেহেতু 'বেসামরিক' (المدنيّ) শব্দের অর্থ দ্বারা ঐসব ব্যক্তিদের বোঝান যাদেরকে শরী'য়ত এই 'কুফর' বিশেষণ দ্বারা সুনির্দিষ্ট করেছে। কারণ তাঁদের মতে দলীলগুলোর সার্বজনীনতা এই অর্থ প্রকাশ করে। এই দলীলসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে

- আল্লাহ তা'আলার এই বাণী:

﴿... فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ﴾ [التوبة: ٥]

"... তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো।"[২৩] সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকল মুশরিককে হত্যা করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যদি না সে ইসলাম গ্রহণ করে।[২৪] এ নির্দেশটি ব্যাপক। এই ব্যাপকতার আওতা থেকে কোনো দলীল ছাড়া কাউকে বাদ দেয়া যায় না। আর নারী ও শিশু ব্যতিত অন্য কাউকে বাদ দেয়ার ব্যাপারে কোনো দলীল বর্ণিত হয় নি। সুতরাং তারা ব্যতিত বাকিরা উপরোক্ত মূলনীতি (তথা কুফরির কারণে যুদ্ধ) এর উপর অবশিষ্ট থাকবে।

- আরেকটি দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ... » . (الحديث).

"আমি জনগণের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, ...।" (আল-হাদিস)।[২৫] সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দেন যে, তিনি কাউকে বাদ না দিয়ে সকল মানুষের সাথে যুদ্ধ করবেন, যতক্ষণ না তারা বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই[২৬] ... এই সার্বজনীন বক্তব্য থেকে শরী'য়ত প্রবর্তক (আল্লাহ) যাদেরকে বাদ দিয়েছেন, তারা ব্যতিত কোনো অমুসলিম নাগরিক বাদ যাবে না। আর নারী ও শিশু ব্যতিত অন্য কাউকে বাদ দেয়ার ব্যাপারে কোনো দলীল বর্ণিত হয় নি। সুতরাং তারা ব্যতিত বাকিরা উপরোক্ত (তথা কুফরির কারণে যুদ্ধ) মূলনীতির উপর অবশিষ্ট থাকবে।

তবে অধিকাংশ আলেম অন্যান্য দলিল পেশ করেছেন যা এই আলোচ্য (কুফরির কারণে যুদ্ধ) এই সার্বজনীনতাকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাঁরা হত্যা করার জন্য অনিবার্য কারণ হিসেবে বিবেচনা করেন 'যুদ্ধে অংশগ্রহণ' করাকে (কুফরীকে নয়)। সুতরাং সেই ব্যক্তিই বেসামরিক লোকদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত যার পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা প্রত্যাশা করা যায় না, যেমন যুদ্ধবিরতি বা সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তি যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দানকারী নয়, যেমন: অতি বৃদ্ধ, শিশু, সাধারণ পুরুষ-নারী, ব্যবসায়ী, কৃষক, শ্রমিক, চিকিৎসক, ধর্মীয় মিশনের সদস্য, বিচারক, পঙ্গু, প্রতিবন্ধী, যুদ্ধবন্দি

এবং রাষ্ট্রীয় কর্মচারীগণ।[২৭] বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, জিহাদের 'ইল্লত বা মূল কারণ 'কুফর' নয়, বরং যুদ্ধ বা যুদ্ধরত অবস্থা। আর এ নিয়ম প্রাথমিকভাবে ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে না। এর যুক্তি হলো, যাহেরিয়্যাগণ ও ইমাম শাফে'য়ী র. (তাঁর এক মতানুসারে) মেনে নিয়েছেন যে, নারী ও শিশুগণ কাফির হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে হত্যা করা হারাম। সুতরাং এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিয়াস করে তাদের মধ্যে গণ্য করা হবে যে ব্যক্তি নিজেকে যুদ্ধে নিয়োগ করেনি; যেমন: কৃষক, শ্রমিক ও কারিগরগণ এবং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে শান্তির কথা বলে ও নিজের হাতকে (যুদ্ধ থেকে) সংবরণ করে।

(খ) আন্তর্জাতিক আইনে বেসামরিক নাগরিকগণ

আন্তর্জাতিক আইন বিশারদগণ 'আলমাদানিউন' (المدنيّون) বা 'বেসামরিক নাগরিক' এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মতভেদ করেছেন। এগুলো নিম্নরূপ:

প্রথম সংজ্ঞা: 'আলমাদানিউন' (المدنيّون) বা 'বেসামরিক নাগরিক' তারা যারা শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে না এবং যুদ্ধবিষয়ক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে না।"[২৮]

দ্বিতীয় সংজ্ঞা: ১২/৮/১৯৪৯ তারিখের 'জেনেভা কনভেনশন' এর ৪ নং অনুচ্ছেদে যুদ্ধের সময়কার বেসামরিক নাগরিকদের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে: তারা "এমন ব্যক্তিবর্গ, যারা যুদ্ধ বা দখলদারিত্ব চলাকালে নির্দিষ্ট সময়ে যেভাবেই হোক না কেন নিজেদেরকে দেখতে পায় বিবাদমান এমন এক পক্ষের কর্তৃত্বাধীন, অথবা এমন এক রাষ্ট্রের দখলদারিত্বের অধীন, যার নাগরিক তারা নয়।"[২৯] এ ধারায় উল্লেখিত হয়েছে কিছু ব্যতিক্রম যাতে কিছু লোকের উল্লেখ করা হয়েছে যারা এ রক্ষাব্যবস্থার আওতামুক্ত থাকবে; যেমন:

- এ চুক্তির সাথে যে রাষ্ট্র সংযুক্ত নয় সেই রাষ্ট্রের জনগণকে এই চুক্তি রক্ষা করে না;
- নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ, যারা নিজেদের দেখে যুদ্ধরত রাষ্ট্রের ভূমিতে। অনুরূপভাবে যুদ্ধরত রাষ্ট্রের সাথে সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ রাষ্ট্রের প্রজাগণকেও এমন ব্যক্তিবর্গের সারিতে বিবেচনা করা হয় না যাদেরকে রক্ষাচুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা যে রাষ্ট্রের

নাগরিক সে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব তাদের অবস্থানকৃত রাষ্ট্রে থাকবে।

- যে লোকজনকে তিনটি জেনেভা কনভেনশন রক্ষা করে। আর তা হচ্ছে নিম্নরূপ:

– ময়দানে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মধ্যকার আহত ও অসুস্থ ব্যক্তিদের অবস্থার উন্নতিসাধনে বিশেষ চুক্তি।

– সমুদ্রে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মধ্যকার আহত, অসুস্থ ও পানিতে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের অবস্থার উন্নতিসাধনে বিশেষ চুক্তি।

– যুদ্ধবন্দীদের রক্ষায় বিশেষ চুক্তি।[৩০]

এসব লোক সাধারণভাবে রক্ষানীতির বাইরে নয় তবে সেখানে বেসামরিক নাগরিকদের থেকে তাদের অবস্থা ভিন্ন হওয়ায় তাদের জন্য বিশেষ রক্ষা চুক্তি রয়েছে। কেননা তারা যুদ্ধে যোগদানকারী ও অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

পূর্বে উল্লেখিত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'বেসামরিক নাগরিকগণ'-এর প্রথম সংজ্ঞাটি বেশি গ্রহণযোগ্য। সুতরাং এটাকেই গ্রহণ করা উচিত। কারণ এটি আন্তর্জাতিক আইনে উল্লেখিত 'বেসামরিক নাগরিক'-এর ধারণাকে যথার্থভাবে প্রকাশ করে; কেননা 'আল-মাদানী' (المدنيّ) বা 'বেসামরিক নাগরিক' হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে কোনোভাবেই যুদ্ধ বিষয়ক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেনি, সে শহরে বাস করুক বা না করুক। সৈন্যবাহিনী, সেনাপতি ও তাদের সাথে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ এ সংজ্ঞার বহির্ভূত। 'বেসামরিক নাগরিকগণ'-এর দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র অথবা জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের প্রজাগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ; আর চতুর্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'প্রথম ব্যতিক্রমটি' এই সংজ্ঞাকে সমর্থন করে। সুতরাং এই সংজ্ঞাটি আন্তর্জাতিক আইনে বর্ণিত 'আল-মাদানিউন' (المدنيّون) বা 'বেসামরিক নাগরিকগণ' -এর পারিভাষিক সংজ্ঞার মতো পরিপূর্ণ অর্থবহ সংজ্ঞা নয়। কারণ ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের চতুর্থ জেনেভা চুক্তির চতুর্থ অনুচ্ছেদ উল্লেখিত তিন শ্রেণির লোককে বাদ দেয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছে। এ চুক্তিতে উল্লেখিত বেসামরিক নাগরিকদের জন্য স্বীকৃত রক্ষানীতির সুবিধা বিষয়ক বিধানটি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীর জন্য অপ্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়। কারণ তারাও 'আল-মাদানিউন' (المدنيّون) বা বেসামরিক

নাগরিকসমষ্টি; আর যুদ্ধনীতি সংক্রান্ত মূলনীতিসমূহের ধরণই হচ্ছে এই যে তা আন্তর্জাতিক; যা সকল রাষ্ট্রের জন্য অবশ্য-পালনীয় এবং যা শুধু হেগ চুক্তিপত্রে বা এই মূলনীতির উল্লেখকারী চতুর্থ জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী পক্ষসমূহের জন্যই প্রযোজ্য নয়। এভাবে এ মূলনীতিসমূহ দখলকৃত ভূমিসমূহে অবস্থানকারী সকল বেসামরিক নাগরিকের জন্য রক্ষাকারী হিসেবে বিবেচিত।[৩১] প্রত্যেক ব্যক্তির, যার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের 'আল-মাদানী' (المدني) বা 'বেসামরিক নাগরিক' পরিভাষাটি যথাযথভাবে প্রযোজ্য হবে তার, পূর্ণ অধিকার থাকবে যুদ্ধনীতি আইন অথবা সামরিক দখলদারিত্ব আইনের বিধিবিধান সমূহ উপভোগ করার। তদনুযায়ী তৃতীয় শ্রেনীর লোকেরা বিশেষ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করার অধিকারী, আর বিশেষ আইনসমূহ তাদেরকে বিজয়ীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে; কারণ তারা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যের অন্তর্ভুক্ত।

৩ বেসামরিক নাগরিকগণের রক্ষায় শরী'য়ত ও সাধারণ আইনের মূলনীতিসমূহ

(ক) বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষায় শরী'য়তের মূলনীতিসমূহ

ইসলামী শরী'য়ত অরাজকতা, যুলুম-নির্যাতন ও দাসত্ববাদ দ্বারা বেষ্টিত সময়ে এমন এক শাসননীতি দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল নৈতিক চরিত্র, মানব-মর্যাদা ও মানবতার মূলনীতিমালার ওপর। এটি যুদ্ধের সময়ে আহত, নিহত, যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক নাগরিকদের সাথে আচার-ব্যবহার কেন্দ্রিক সার্বিক আচরণ ও রীতিনীতিকে পরিশীলিত করে। এটি মুসলিমগণের জন্য এমন বিধিবিধান প্রণয়ন করে যেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও যেগুলো মেনে চলা যুদ্ধ চলাকালে ও যুদ্ধপরবর্তী সময়ে মুসলিমদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। সাথে সাথে মুসলিমদের জন্য আরও আবশ্যক উক্ত ব্যক্তিদের সম্মান রক্ষা করা এবং আকিদা-বিশ্বাস, 'ইবাদত ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান করা। ইসলামী শরী'আত এমন নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করে যাতে বেসামরিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস করা, পশু-পাখি হত্যা করা এবং পরিবেশ বিনষ্ট করার মত ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড সমূহ সম্পাদিত না হয়। এর পাশাপাশি এটি যোদ্ধা ও বেসামরিক নাগরিকগণের ধন-সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিধান সমূহও প্রণয়ন করেছে এবং বলে দিয়েছে সম্পদের মধ্য থেকে কোনটি নষ্ট করা বৈধ হবে এবং কোনটি নয়; আর যুদ্ধে তা থেকে কী ব্যবহৃত হবে এবং কী ব্যবহৃত হবে না।[৩২]

বেসামরিক নাগরিকদের সাথে আচার-ব্যবহারের বিষয়ে শরী'য়ত সম্মত কিছু মূলনীতি রয়েছে যেগুলো কুরআনুল কারীম ও পবিত্র সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:

* আল-কুরআনে বর্ণিত বেসামরিক ব্যক্তিদের সাথে আচারবিষয়ক মূলনীতি

০ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠ ﴾
[البقرة: ١٩٠]

"আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘন কারীদেরকে ভালবাসেন না।"[৩৩] এর অর্থ হলো, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো এবং এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না। আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত 'সীমালঙ্ঘন' মানে যুলুম-নির্যাতন করা এবং সীমা ও অধিকার ছাড়িয়ে যাওয়া বা খর্ব করা। এ সীমালঙ্ঘনের সর্বোচ্চ স্তর হলো, মানব জীবনের সাথে আবশ্যকীয় ভাবে সম্পৃক্ত সম্মানের হানি ঘটানো। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে সাধারণভাবে নিষেধাজ্ঞা এসেছে যাতে তা প্রত্যেক আনুসঙ্গিক বিষয় ও পরিবেশ-পরিস্থিতিকে শামিল করতে পারে। এ কারণেই তিনি সকল প্রকার কষ্ট-প্রদানকে নিষিদ্ধ করেছেন; যেমন অঙ্গবিকৃতি করা, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাৎ করা এবং বিশেষত নারী, শিশু ও বয়ঃবৃদ্ধদেরকে হত্যা করার মতো নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে যাওয়া, যুদ্ধের ব্যাপারে যাদের কোনো অভিমত বা সিদ্ধান্ত নেই এবং যাদের মধ্য থেকে কেউ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না।[৩৪] আর এটা ইবনু 'আব্বাস[৩৫] রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা, হাসান আল-বসরী[৩৬] র. ও ওমর ইবন আবদিল আযীয[৩৭] র. - এর অভিমত।

অবশ্য কিছু সংখ্যক আলেমের[৩৮] মতে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার [পূর্বে বর্ণিত ১৯০ নং] আয়াতটি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। যে আয়াতদ্বয় দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী:[৩৯]

﴿ وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةٗ كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ كَآفَّةٗۚ ﴾ [التوبة: ٣٦]

(এবং তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করো, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে।)[৪০] এবং আল্লাহ তা'আলার অন্য বাণী

﴿ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]

(সুতরাং তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানে পাও, সেখানে হত্যা করো।)[৪১] তাঁরা বলেন, এ আয়াতদ্বয়ে নির্দেশিত 'সকল কাফিরের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের নির্দেশ' দ্বারা পূর্বে বর্ণিত [সূরা বাকারার ১৯০ নং] আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে।

তবে বিশুদ্ধ মতটি ইবনু আব্বাস রা., হাসান বসরী র. ও ওমর ইবন আবদিল 'আযীয র. ব্যক্ত করেছেন। তা হচ্ছে, সূরা বাকারার ১৯০ নং আয়াতটি 'মুহকাম' (সুস্পষ্ট), 'মানসূখ' বা রহিত নয়। বরং [সূরা বাকারার] আয়াতের অর্থ হলো: 'তোমরা যুদ্ধ করো ঐসব লোকদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থার মধ্যে রয়েছে এবং তোমরা নারী, শিশু ও তাদের মতো (নিরীহ) লোকদেরকে হত্যা করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করো না।

০ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِۦ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۝٤ ﴾ [القصص: ٤]

"নিশ্চয় ফির'আউন যমীনের বুকে অহংকারী হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে হীনবল করেছিল; তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।"[৪২] আয়াতটির ব্যাখ্যা হলো, ফির'আউন মিসরের মাটিতে অহমিকা প্রদর্শন করেছিল এবং দেশের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তার সেবকের জাতে পরিণত করেছিল। সে বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দুর্বল করেছিল। সে তাদের নবজাতক ছেলেদেরকে জবাই করে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিত। ফির'আউনের এই অপঃতৎপরতার পেছনে ইন্ধন যুগিয়েছিল কিছু সংখ্যক জ্যোতিষীর কথা। তারা বলতো, নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈলের মধ্যে এমন এক ছেলের জন্ম হবে যে ফির'আউনের রাজত্বের পতনের কারণ হবে। সে ছিল

হত্যা ও অন্যান্য ত্রাসের দ্বারা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আল-কুরআন ফির'আউনের দোষ ত্রুটি প্রকাশ করেছে এবং মানুষের 'কারামাহ' (كرامة) তথা মানব মর্যাদার সাথে তার ন্যাক্কারজনক আচরণের কারণে তাকে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের তালিকাভুক্ত করেছে। বস্তুত 'কারামাহ' (كرامة) শব্দটি যত্ন ও দেখাশোনার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের মান-মর্যাদা সংরক্ষণের তাগিদ দিয়ে যে মূলনীতি প্রদান করেন তা হলো:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ ﴾ [الاسراء: ٧٠]

"আর আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।"[৪৩]

০ আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]

"দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে।"[৪৪]

তিনি আরও বলেন:

﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْۚ ﴾ [الكهف: ٢٩]

"আর বলুন, 'সত্য তোমাদের রবের কাছ থেকে; কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছে কুফরী করুক'।"[৪৫] তিনি আরও বলেন:

﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ ﴾ [التكوير: ٢٨]

"তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য।"[৪৬] সুতরাং ইসলামী শরী'য়ত মানুষের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কাউকে বাধ্য করা অথবা অমুসলিমদের উপর ইসলামের বিধান চাপিয়ে দেয়া বৈধ নয়। ইসলামী শরী'য়ত মানুষের জন্য ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বাধীনতার যে অধিকার দিয়েছে, শরী'য়ত চাইলে তার কাছ থেকে সেই অধিকার হরণ করতে পারতো এবং সকল মানুষকে একই জাতিতে পরিণত করতে পারতো। কিন্তু তা না করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রতি ঈমান ও মন থেকে তাঁকে মেনে নেয়ার ভিত্তিতে মানুষের জন্য দ্বীনের মধ্যে প্রবেশের ব্যবস্থা করেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি শরী'য়ত ভিত্তিক ও সৃষ্টিতাত্ত্বিক দলিল ও প্রমাণ তৈরি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ ٩٩﴾ [يونس: ٩٩]

"আর আপনার রব ইচ্ছে করলে যমীনে যারা আছে তারা সবাই ঈমান আনতো; তবে কি আপনি মু'মিন হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবেন?"[৪৭]

* পবিত্র সুন্নাতে বর্ণিত বেসামরিক ব্যক্তিদের সাথে আচরণ বিষয়ক মূলনীতি

০ ইবনু ওমর[৪৮] রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه و سلم , فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء والصبيان» .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো এক যুদ্ধে জনৈকা মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেন।"[৪৯] অপর এক বর্ণনায় রয়েছে:

« ... فأنكر رسول الله صلى الله عليه و سلم قتل النساء والصبيان» .

" ... তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে নিন্দা জ্ঞাপন করেন।"[৫০] এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী[৫১] র. বলেন, "এই হাদিসের উপর আমল করা এবং নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন, কেননা তখন তারা যুদ্ধে লিপ্ত থাকে না।"[৫২]

০ বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

«وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا». [তোমরা শিশু-কিশোরকে হত্যা করো না]; 'ওয়ালীদ' (الوليد) মানে এমন ব্যক্তি যার বয়স দায়িত্ব গ্রহণ করার পর্যায়ে উপনীত হয়নি।[৫৩] এ প্রসঙ্গে বহু হাদিস রয়েছে।[৫৪]

০ মালেক র. থেকে বর্ণিত, তাঁর কাছে বর্ণনা এসেছে যে, ওমর ইবন আবদিল আযীয র. তাঁর কোনো এক গভর্নরের নিকট চিঠি লিখেছেন: আমাদের

নিকট তথ্য এসে পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সৈন্যদল প্রেরণ করতেন তখন তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন:

«اغزوا باسم الله في سبيل الله ، تقاتلون من كفر بالله ، لا تغلوا . ولا تغدروا . ولا تمثلوا . ولا تقتلوا وليداً » . و قل ذلك لجيوشك و سراياك إن شاء الله . والسلام عليك » .

“তোমরা আল্লাহর পথে আল্লাহর নামে যুদ্ধ করো, লড়াই করবে ঐ ব্যক্তির সাথে যে আল্লাহকে অস্বীকার করে; তোমরা বাড়াবাড়ি করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, অঙ্গবিকৃতি করো না এবং শিশুকে হত্যা করো না।” তুমি এই কথাগুলো তোমার সৈন্যদেরকে ও সৈন্যবাহিনীকে বলে দাও ইন্‌শাআল্লাহ, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।”[৫৫] এর মধ্যে কতগুলো ফায়দা রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে সবাই একমত। এগুলো হলো, বিশ্বাসঘাতকতা করা, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাৎ করা এবং শিশু-কিশোরগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলে তাদেরকে হত্যা করা হারাম; অঙ্গবিকৃতি ঘটানো মাকরূহ; এবং রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক তার বিভিন্ন এলাকার শাসনকর্তা ও সৈন্যবাহিনীকে তাকওয়া, কোমলতা, যুদ্ধের সময়ের প্রয়োজনীয়তা, তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য, তাদের জন্য কোনগুলো হালাল বা হারাম বা মাকরূহ বা মুস্তাহাব প্রভৃতি সম্পর্কে জানার উপদেশ দেয়া মুস্তাহাব।[৫৬]

০ না‘য়ীম ইবন মাস‘উদ[৫৭] রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুসায়লামা আল-কায্যাবের চিঠি পাঠ করেন, তখন আমি তাঁকে মুসায়লামা আল-কায্যাবের দূতদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি:

«ما تقولان أنتما ؟ قالا : نقول كما قال . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أما والله لو لا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما » .

“তোমরা কী বল? জবাবে তারা বলল: সে যা বলে আমরাও তাই বলি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: জেনে রাখ, আল্লাহর কসম! দূতকে হত্যা করা যায় না, যদি এ বিধান না থাকতো, তাহলে আমি তোমাদের দুজনের গর্দান উড়িয়ে দিতাম।”[৫৮] এই হাদিসটি ইসলামে এবং তার পূর্ববর্তী সময়ে দূত হত্যা করা বৈধ না হওয়ার উপর সুস্পষ্ট দলীল। তা যদি বৈধ হতো, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার

মুসায়লামা আল-কায্যাবের দূতদ্বয়কে হত্যা করে ফেলতেন; কিন্তু তা তিনি করেননি, আর এভাবেই সুন্নাত অব্যাহত রয়েছে।[৫৯] শরী'য়তের দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশগুলো সাহাবীদের মধ্য থেকে আবূ বকর রা., ওমর রা., 'উসমান রা., আলী রা. ওমর ইবন আবদিল আযীয র. ও খালিদ ইবন ওয়ালিদ রা. - এর মতো খলিফা ও সেনানায়কগণ বাস্তবায়িত করেন[৬০] এবং তাঁরা এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিকে তাঁদের শরী'য়ত সম্মত শাসননীতির মধ্যে সুদৃঢ় করেন। বর্ণিত আছে যে, প্রথম খলিফা (আবূ বকর রা.) কোনো এক সেনাপতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

« ... إني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة ، ولا صبيا ، ولا هرما ، ولا تقطعن شجرا مثمرا ، ولا تخربن عامرا ، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ، ولا تغلل ، ولا تجبن » .

" ... আমি তোমাকে দশটি বিষয়ে উদেশ দিচ্ছি: অবশ্যই তুমি নারী, শিশু ও বয়োবৃদ্ধ মানুষকে হত্যা করবে না; আর ফলবান বৃক্ষকে কেটে ফেলবে না; আর কখনও বসতিপূর্ণ অঞ্চলকে বিনষ্ট করবে না; আর খাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত কখনও ছাগল ও উট যবাই করবে না; আর অবশ্যই তুমি খেজুর গাছ আগুনে পুড়াবে না এবং পানিতেও ডুবাবে না; আর তুমি (যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে) খেয়ানত করবে না এবং ভীরু বা কাপুরুষ হবে না।"[৬১]

আর এই মূল নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের বিভিন্ন আইনশাস্ত্রবিদ রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ভিত রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে আমরা কয়েকজনের কথা উল্লেখ করছি। যুদ্ধ ও শান্তির ক্ষেত্রে আবদুর রহমান আওযা'য়ী[৬২] র. ছিলেন যুক্তিসঙ্গত, সূক্ষ্ম ও মানবতা-বান্ধব এমন ফতোয়া সমষ্টির প্রবর্তক যা সকল মানুষকে একটি পরিবার হিসেবে বিবেচনা করে যাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো ন্যায় ও সাম্যের ছায়াতলে বসবাস করা। তিনি যুদ্ধের সময়ে কৃষক, সাধারণ জনগণ, ধর্মগুরু, অক্ষম ব্যক্তিবর্গ ও মঠ-গীর্জার তত্ত্বাবধায়কদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হারাম বলে ঘোষণা করেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা যুদ্ধ সংক্রান্ত কোনো কাজে অংশগ্রহণ করে। তেমনিভাবে তিনি শিশু-কিশোর ও নারীদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হারাম বলে ঘোষণা করেন, এমনকি যদি তাদের সাথে শত্রুগণ মিশে থাকে

তবুও। তিনি শত্রুর ধন-সম্পদ, পশু-পাখি ও বৃক্ষরাজি ধ্বংস করাকে অবৈধ বলে রায় দেন। তিনি এসব ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে মুসলিমগণের খলিফাদের উপদেশ ও নির্দেশনার উপর নির্ভর করতেন। বিশেষ করে খলিফা আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ফরমানের উপর নির্ভর করতেন যা তিনি উসামা ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট প্রেরণ করেন, যখন তিনি শাম দেশের পথে ছিলেন।

এটিই হলো মূল বিষয়, যাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন ফকীহ মুহাম্মদ ইবন হাসান আশ-শায়বানী।[৬৩] আশ-শায়বানীর এ অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক আইনের প্রখ্যাত পন্ডিতগণ ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানীতে 'শায়বানী আইনসভা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁরা তাঁর মৃত্যুর এক হাজার দুইশত বছর পূর্তির স্মরণে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান করেন।

তকী উদ্দীন ইবনু তাইমিয়্যা[৬৪] অভিমত পেশ করেন, "যে ব্যক্তি প্রতিরোধকারী ও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নয়, অধিকাংশ আলেমের মতে তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত হত্যা করা যাবে না যতক্ষণ না সে কথা বা কাজের মাধ্যমে যুদ্ধ করে; যেমন নারী, শিশু, সন্যাসী বা ধর্মগুরু, অন্ধ ও প্রতিবন্ধী[৬৫] বা আক্রান্ত ব্যক্তি।"[৬৬]

আমিও বিশ্বাস করি যে, ফকীহগণের এ রায়টি সঠিক। কারণ, যুদ্ধ তো ঐ ব্যক্তির জন্য যে যুদ্ধ করে। রায়টিকে আরও শক্তিশালী করে উম্মতের আলেমগণের পক্ষ থেকে বর্ণিত ইজমা বা ঐকমত্য। ইবনুল বার[৬৭] বলেন: "এ কথার উপর আলেমগণের ইজমা বা ঐক্যবদ্ধ রায় ঘোষিত হয়েছে; সুতরাং তাদের মতে শত্রু যোদ্ধাগণের নিয়ন্ত্রণাধীন নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা বৈধ নয়; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ ﴾ [البقرة: ١٩٠]

"আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো[৬৮]।"[৬৯], ইবনুল হাম্মাম[৭০] বলেন: "কোনো সন্দেহ নেই যে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা হারাম হওয়ার বিষয়টি ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।"[৭১] ইবনু জুযাই[৭২] বলেন, "সর্ব সম্মতিক্রমে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা যাবে না।"[৭৩]

ফকীহগণ নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে কতগুলো কারণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কিছু কারণ নিম্নরূপ:

- হত্যা করতে নিষেধ করার কারণটি হলো, তারা যুদ্ধ বা যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে তাদেরকে হত্যা করা হবে না। মূল বিষয় হলো জীবনহানি না করা। রক্তপাত দ্বারা বিশ্বকে অশান্ত করা শরী'য়ত প্রবর্তকের উদ্দেশ্য নয়, বরং তাঁর উদ্দেশ্য হলো যথাসম্ভব শান্তিস্থাপন করা। তাছাড়া মানুষ এমন এক সৃষ্টি, যার রক্ত পবিত্র ও সুরক্ষিত; অনিষ্টতা প্রতিরোধের জন্য তাকে হত্যা করার বৈধতা দেয়ার বিষয়টি সাময়িক। যাদের ব্যাপারে যুদ্ধ কিংবা শত্রুতার সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত না হবে তারা আসল সুরক্ষা নীতির উপর অটুট আছে বলে ধরা হয়।[৭৪]

- হত্যা করাটা কুফরের প্রতিদান নয়। কারণ, দুনিয়া হচ্ছে দায়িত্ব অর্পণের জায়গা, প্রতিদান দেওয়ার জায়গা নয়। দুনিয়াতে হত্যা তো কেবল কোনো গুরুতর ও জঘন্যতম অপরাধের বিপরীতেই আবশ্যক হয়; যাতে করে বান্দাদের স্বার্থ গুলো সুবিন্যস্ত থাকে। এর আরও কারণ হচ্ছে, কিছু লোক শুধু ধমক বা হুমকিতেই অন্যায় কাজ থেকে নিবৃত থাকে না, (হত্যার মতো শাস্তির বিধান না হলে তারা নিবৃত হয় না; তবে নারী কিংবা শিশুরা এর রকম নয়)। এ জন্যই নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করার বিধান ইসলাম সমর্থন করে না।[৭৫]

- নারী ও শিশুদেরকে বেঁচে থাকার সুযোগ দিলে কোনো ক্ষতি হয় না; কারণ হত্যা করার উদ্দেশ্য হলো বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দূর করা; আর তাদেরকে ঘিরে কোনো ফেতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা নেই।

উপরের আলোচনায় দেখা যায়, অধিকাংশ ফকীহ কয়েকটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যদি তারা যুদ্ধ না করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা বৈধ হবে না; যেমন নারী, শিশু ও দূতগণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফকীহগণ দূতদেরকে যে কাফিরদের হত্যা করা বৈধ নয় তাদের আওতাভুক্ত বলে উল্লেখ করেন নি; কারণ তারা তো দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপত্তামূলক পরিস্থিতিতে প্রবেশ করে; কিন্তু যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সে নিরাপত্তা চুক্তি[৭৬] ব্যতিতই ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে তবুও তাকে হত্যা করা যাবে না; আর এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।[৭৭]

সারবস্তুঃ মৌলিকভাবে বেসামরিক নাগরিকগণ শরী'য়তের নস বা বক্তব্যের দ্বারা রক্ষাবেষ্টনীতে সুরক্ষিত; এবং আমরা তাদেরকে বাস্তবে দেখতে পাই যে, তারা ইসলামী আরব সভ্যতার ছায়াতলে বসবাস করেছে স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের সাথে।

(খ) বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষায় সাধারণ আইনের মূলনীতিসমূহ

আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইন নামে যা পরিচিত তা পূর্বে ছিল না। যুদ্ধসমূহ মানুষের জন্য বহু ধ্বংসযজ্ঞ ও নাশকতার ছাপ রেখে গেছে, পরবর্তী সময়ে বহু রাষ্ট্র এসব ক্ষতচিহ্ন বা ধ্বংসাত্মক আঘাতকে ম্রিয়মান করার জন্য তাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের দিকে মনোযোগ দিয়েছে যা বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষা এবং যুদ্ধরত ব্যক্তিদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ চুক্তিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলঃ ওয়েস্টাফলিয়া (Westphalie) চুক্তি, যার সম্পাদনার মাধ্যমে ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিশ বছর যাবত চলমান যুদ্ধের ইতি টানা হয়।[৭৮] পরে অবস্থার উন্নতি হয় খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে, যখন সংঘটিত হয় ফ্রান্স বিপ্লব। অতঃপর যুদ্ধ আইনের মূলনীতিসমূহ রূপান্তরিত হয় আন্তর্জাতিক আইনের অংশে, যা অনুসরণ করাটা হয় বাধ্যতামূলক। অতঃপর ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধবন্দীর সাথে নির্দিষ্ট আচরণবিধি প্রণীত হয়।[৭৯]

খ্রিষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনের মূলনীতি সংকলনের দাবী জোরদার হয় এবং দাবিদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিস সমুদ্র সম্মেলনের মাধ্যমে এ দাবি পূরণ করা হয়। একই উদ্দেশ্যে ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত হয় প্রথম জেনেভা চুক্তি। এ বিষয়ে হেগে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৮৯৯ ও ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে।[৮০]

যুদ্ধের বিধ্বংসী প্রভাব নিয়ন্ত্রণ ও তার ধ্বংসযজ্ঞ কমিয়ে আনার জন্য এতো চেষ্টা-সাধনা সত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ খ্রি. থেকে ১৯১৮ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ খ্রি. থেকে ১৯৪৫ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভয়াবহ ধ্বংসচিহ্ন রেখে গেছে। যুদ্ধ দুটি সুস্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক আইনের ধূসরতা বা অনুরূপ আইনের ব্যর্থ-চেষ্টা ও নিষ্ফলতাই প্রকাশ করেছে; আর সম্ভবত দ্বিতীয় কথাটি হলো বাস্তবতার খুব কাছাকাছি।

এর পরে ব্যাপক পরিসরে আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ সম্পাদিত হয়েছে। এসব চুক্তি সম্পাদনকারী নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা হলো প্রায় ১৯০। এর মধ্যে

বিশ্বের সকল দেশ না হলেও অধিকাংশ দেশই অন্তর্ভুক্ত। চুক্তি সমূহের মধ্যে প্রধান হলো চারটি জেনেভা চুক্তি, যেগুলো প্রণীত হয় ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং (কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে) পূর্ণতা পায় ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে।[৮১]

সুতরাং দেখা যায়, বেসামরিক নাগরিকদের প্রতিরক্ষার জন্য আইনি মূলনীতি বা তথ্য-সূত্রসমূহ উল্লেখিত চুক্তিসমূহ অথবা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণার মাধ্যমে আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। এগুলো নিম্নোক্তভাবে তারিখ ভিত্তিক বিন্যাসের মাধ্যমে বর্ণিত হলো:

– আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা যা ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রণীত হয়; এটি মানুষের জন্য অধিকার নির্ধারণ করেছে, তা যুদ্ধের সময়ে হোক অথবা শান্তিপূর্ণ সময়ের মধ্যে হোক।

– বিশেষভাবে যুদ্ধচলার সময়ে বেসামরিক নাগরিকদের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে চতুর্থ জেনেভা চুক্তি ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্টে সম্পাদিত হয়। তার কোনো কোনো অনুচ্ছেদে বেসামরিক নাগরিকগণ এবং যোদ্ধাদের মধ্যে আহত, অসুস্থ ও অনুরূপ ব্যক্তিগণের রক্ষার ব্যাপারে বক্তব্য এসেছে। অনুরূপ ভাবে বক্তব্য এসেছে শিশু, নারী ও বয়স্কগণকে রক্ষার ব্যাপারে এবং হাসপাতাল ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের মতো জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান রক্ষা করার ব্যাপারে। জেনেভা চুক্তির সাথে দুটি অতিরিক্ত প্রটোকলও রয়েছে যেগুলো আন্তর্জাতিক সশস্ত্র যুদ্ধবিধ্বস্ত লোকজনের রক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট। এগুলো ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়।[৮২]

– মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা বিষয়ক ইউরোপীয় চুক্তি ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সম্পাদিত হয়।[৮৩] এটিও মানুষের অধিকারের জন্য আন্তর্জাতিক বিধিবিধান প্রণয়ন করেছে এবং কোনো কোনো আন্তর্জাতিক আইন বিশ্লেষক সেটিকে জেনেভা চুক্তিসমূহের বিধিবিধানগুলোর পরিপূরক বিবেচনা করেন।[৮৪]

– মানবজাতিকে নির্মূলকরণ ও তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার অপরাধ নিবারণের বিশেষ আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সম্পাদিত হয়। বেসামরিক নাগরিকগণ সবচেয়ে বড় যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হলো গণহত্যা, যা দখলদার রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়।[৮৫] দখলদার রাষ্ট্রের গণহত্যা থেকে বেসামরিক জনগণকে রক্ষার জন্য প্রণীত হয় এই চুক্তি।

– রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তিটি যেসব অধিকার নিয়ে এসেছে সেগুলো শান্তিপূর্ণ ও যুদ্ধ উভয় সময়ে প্রযোজ্য।[৮৬]

পরিশেষে, লোকজন জানতে চায় প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধ আইন মানার কতটুকু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কোনো রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক চুক্তি সই করুক বা না করুক, যুদ্ধ আইনে যে বিধিবিধান রয়েছে সেগুলোর বাধ্যবাধকতা থেকে সে কি অব্যাহতি পেতে পারে?

জবাবঃ না, যুদ্ধ আইনের বিধিবিধান গুলো বিশ্বজনীন। সকল রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক। শুধু হেগ চার্টার অথবা চতুর্থ জেনেভা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের জন্য নয়; প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যক হলো এ আইনগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং এগুলোকে মেনে চলা।[৮৭]

৪. উপসংহার

– আন্তর্জাতিক ইসলামী আইনশাস্ত্র মানবাধিকারের প্রশ্নে এবং যুদ্ধের নিয়ম-কানুন ও মূলনীতির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ শাস্ত্র মানুষকে শান্তিপূর্ণ ও যুদ্ধচলার সময়ে মানুষ বলে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং তাকে সম্মান করে, চাই সে যোদ্ধা হোক অথবা বেসামরিক নাগরিক হোক। সবার জন্যই তা সমানভাবে কার্যকর। বেসামরিক নাগরিকগণকে আক্রমণ করা বৈধ নয় বলে আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ঘোষণা করে। কিন্তু যুদ্ধ অথবা সশস্ত্র লড়াইয়ের সময়ে বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষার ব্যাপারে কয়েক শতাব্দী পূর্বেই ইসলামী শরী'আতে নিয়ম-কানুন এসেছে এবং বাস্তবে তার প্রয়োগ ঘটেছে।

– ফকীহগণ ফিকহ তথা ইসলামী আইনশাস্ত্র ও বাস্তবতাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে দেখতে যত্নবান ছিলেন। তাদের আইনশাস্ত্র বাস্তবতার তালে তালেই চলতো। যদিও তাদের মতে মূল-বিষয় হলো বনী আদমের সম্মানের গ্যারান্টি দানকারী রক্ষানীতির নিশ্চয়তা বিধান তবুও তাদের এ অবস্থান মাঝে-মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে যখন শত্রু এই মূলনীতির বিপরীত কাজ করে। তখন শত্রুদের সাথে তাদের সমান সমান আচরণ করা অথবা যথাযথ জবাব দেয়াই হয় যথাযথ। কারণ তাদেরকে প্রতিহত করার একমাত্র পথ হয় ঐ জবাব দেয়া।

– আন্তর্জাতিক ইসলামী আইনশাস্ত্র বা ফিকহ মানবাধিকার প্রশ্নে যা উদ্ভাবন করেছে এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন যা উদ্ভাবন করেছে তার মধ্যে সাধারণভাবে বস্তুগত কোনো পার্থক্য পাওয়া যায় না। সম্ভবত বিভিন্ন ধর্মের সাথে বিশেষ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হলে তা মানবাধিকারের পরিধিকে আরও বেশি গভীরতা ও ব্যাপকতা প্রদান করবে। এ কারণে আমাদের জন্য খুবই জরুরি হচ্ছে সাধারণভাবে সকল ধর্মে, বিশেষ করে ইসলামী শরী'আতে যে সকল স্থায়ী শিক্ষা ও উন্নত চরিত্র বিষয়ক ও আবশ্যকীয় নীতিসমূহ রয়েছে সেগুলো দ্বারা মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সাধারণ মতবাদকে সমৃদ্ধ করা; যাতে করে তা যুদ্ধচলার সময়ে ও শান্তিপূর্ণ সময়ে মানুষ ও পরিবেশ রক্ষা করাকে মানুষের আকিদা-বিশ্বাস ও আবশ্যকীয় কর্তব্যের অংশ বানিয়ে দেয়।

– সে অবস্থান থেকে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূলনীতিসমূহ ইসলামের বক্তব্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বাইরে নয় বরং এ আইনের বিধিবিধান গুলোর উৎস এই নির্ভুল দীনের মধ্যে পাওয়া যাবে।

– বেসামরিক নাগরিকদের অধিকারসমূহ তুলে ধরার জন্য ফিকহ একাডেমি ও মানবাধিকার সংস্থাসমূহের ভূমিকা জোরদার করা বিশেষ প্রয়োজন। মানব সমাজে মানবাধিকার সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করণের সামনে প্রতিরোধ সৃষ্টিকারীর ভূমিকা পালনকারী সকল সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার পর্যালোচনা করা এবং এ নিয়ে গবেষণা করা জরুরী। অনুরূপভাবে প্রচার মাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ জাতীয় সীমা-লঙ্ঘন প্রকাশ ও প্রচার করার ব্যাপারে আরও বেশি ভূমিকা পালন করা উচিত।

বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষার ব্যাপারে ইসলামী ধারণা ও নীতিমালা থেকে প্রকাশ পায় যে, ইসলাম এমন এক ব্যবস্থা যা মানুষের মধ্যে বিভক্তি তৈরী করে না। এটি যুদ্ধাবস্থা ও অন্যান্য অবস্থার মধ্যে অথবা অভ্যন্তরীণ লড়াই বা আন্তর্জাতিক লড়াইয়ের মধ্যেও পার্থক্য করে না। অপরদিকে আমরা বিশ্বাস করি যে, ত্রুটি আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে নেই বরং রয়েছে তার যথাযথ বাস্তবায়নে। আর এ ত্রুটির বীজ নিহিত রয়েছে শরী'য়তের আইনের আওতার

বাইরে কিংবা আন্তর্জাতিক আইনের আওতার বাইরে এমন মানুষের মধ্যে যে তার ব্যক্তিগত লোভ-লালসাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ এবং সুবিবেচনা ও মানবিক মূল্যবোধের উপর প্রাধান্য দিতে চায়।

* * *

---

১. ফিরোযআবাদী, আল-কামূসুল মুহীত (القاموس المحيط), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৯ হি., মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১২৭৬; ইবনু মানযুর: লিসানুল আরব, প্রথম প্রকাশ, দারু সাদের, বৈরুত, ১৪/১৯৮।

২. ইবনুল কাত্তা', কিতাবুল আফ'আল (كتاب الأفعال), প্রথম প্রকাশ: ১৪০৩ হি., 'আলামুল কুতুব, বৈরুত, ১/২৬০।

৩. যামাখশারী, আসাসুল বালাগাত (أساس البلاغة), সম্পাদনা: আবদুর রহীম মাহমুদ, দারুল মা'আরেফত, লেবানন, ৯৬।

৪. রাগেব আল-আসফাহানী, মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআনিল কারীম (مفردات ألفاظ القرآن الكريم), সম্পাদনা: সাফওয়ান 'আদনান দাউদী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৮ হি., দারুল কালম দামেস্ক, ২৫৫।

৫. সূরা আল-মা'আরিজ, আয়াত: ১০।

৬. অস্ত্রবিরতি (الهدنة): ইমাম অথবা তার প্রতিনিধি কর্তৃক যোদ্ধাদের সাথে কোন একটি সময়ের জন্য কোন কিছুর বিনিময়ে অথবা বিনিময় ছাড়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন করা। দেখুন: আল-মুগনী (المغني): ইবনু কুদামা, সম্পাদনা: ড. আবদুল্লাহ আত-তুর্কী ও ড. আবদুল ফাত্তাহ, চতুর্থ সংস্করণ: ১৪১৯ হি., দারু 'আলামিল কুতুব: ১৩/১৫৪ - ১৫৭।

৭. ইবনু কুদামা: আল-মুগনী (المغني): ১৩/১৫৯

৮. জাস্‌সাস, আহকামুল কুরআন (أحكام القرآن), সম্পাদনা: ড. মুহাম্মদ আস-সাদিক কামহাভী, প্রকাশকাল:

৯. ১৪০৫ হি., দারু এহইয়ায়িত তুরাছ, বৈরুত, ১৪০৫ হিজরী, ৩/১৯৫।

ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব ১৩/৪০২, ৪০৩; আল-কামূসুল মুহীত (القاموس المحيط), ফিরোয আবাদী, পৃ. ১২৩৩; আনীসুল ফুকাহা (أنيس الفقهاء); আল-কাওনুবী: সম্পাদনা: ড. আহমদ আল-কুবাইসী, প্রথম প্রকাশ ১৪০৬ হি., দারুল ওফা জেদ্দা, ১২৮; মুখতারুস সিহাহ (مختار الصحاح), আর-রাযী, সম্পাদনা: মাহমুদ খাতের, প্রকাশ ১৪১৫ হি., মাকতাবাতু লুবনান, নাশেরুন ১/২৫৮।

১০. শাফে'য়ী, আল-উম্ম (الأم), দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খ্রি., দারুল মা'আরেফত, বৈরুত, ৪/২৪০।

১১. আল - বাহুতী, শরহু মুন্তাহাল ইরাদাত (شرح منتهى الإرادات), সম্পাদনা: আবদুল্লাহ আত-তুর্কী, প্রথম প্রকাশ ১৪২১ হি., মুয়াসসাসাতুর রিসালাত ৩/১৮।

১২. ইবন তাইমিয়্যা, মাজমূ'উ ফাতাভী ইবনে তাইমিয়্যা (مجموع فتاوى ابن تيمية), মাজমূ'উল মুলক ফাহাদ ২৮/৩৫৪।

১৩. আল-কাসানী, বাদায়ে'উস সানায়ে' (بدائع الصنائع), প্রথম প্রকাশ: ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., দারুল মা'আরেফত, বৈরুত ৭/১৬৩।

১৪. ইবনু হাম্মাম, ফাতহুল কাদীর, দ্বিতীয় সংস্করণ, দারুল ফিকর, বৈরুত, ৫/৪৫৩; ইবনু নাজীম, আল-বাহরুর রায়েক (البحر الرائق), দ্বিতীয় সংস্করণ, দারুল মা'আরেফত, বৈরুত, ৫/৮৪; হাশিয়াতু ইবনে 'আবেদীন (حاشية ابن عابدين), ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি., দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ৬/২১৩; আল-ক্বারাফী, আয-যাখীরা (الذخيرة), প্রথম প্রকাশ, ১৪২২ হি., দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, বৈরুত, ৩/২২৭; আশ-শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ (مغني المحتاج), ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি., দারু এহইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, ৬/৬৫; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (المغني) ১৩/১৭৭-১৭৮; ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা (المحلّى), সম্পাদনা: আহমদ শাকের, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি., দারু এহইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, বৈরুত, ৭/২১৪-২১৫।

১৫. হাসান (আবূ গুদ্দা), কাদায়া ফিকহিয়্যা ফিল 'আলাকাতিদ দাওলিয়্যা (قضايا فقهية في العلاقات الدولية), প্রথম প্রকাশ ১৪১৯ হি.,/মাকতাবাতুল 'আবিকান, রিয়াদ: ১৮৩-১৮৫।

১৬. শাওকানী, নাইলুল আওতার (نيل الأوطار) ৭/২০১

১৭. 'আলী ইবন আহমদ ইবন হাযম আল-ফারেসী, মূলে আল-ইয়াযিদী আল-উমাওয়ী আল-কুরতুবী, আবূ মুহাম্মদ, আয-যাহেরী। ইবন হাযম রহ. হাফেয, ফকীহ, মুজতাহিদ, সাহিত্যিক, কবি ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। তিনি ৩৮৪ হিজরীর রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। শুরুতে শাফে'য়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, পরে যাহেরী মতাবলম্বীতে রূপান্তরিত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ থেকে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আল-মুহাল্লা (المحلّى) যা তাঁর মাযহাবের ফিকহ ও ইজতিহাদ বিষয়ে রচিত; আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (الملل و النحل) আল-ঈসাল ফিল ফিকহিল হাদিস (الإيصال في الفقه الحديث) ইত্যাদি। তিনি ৪৫৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। - [দ্রষ্টব্য: ইবনু বাশকুয়াল: আস-সিলাতু (الصلة), দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, মিশর, ১৯৬৬ খ্রি. ৪১৫; সুয়ূতী, ত্বাবাকাতুল হুফ্ফায (طبقات الحفاظ) ৪৩৬; যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায (تذكرة الحفاظ) ২/১১৪৬]।

১৮. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা (المحلّى) ৭/২১৫

১৯. শীরাযী, আল-মুহায্যাব (المهذب), দারুল ফিকর, বৈরুত: ২/২৩৪; নববী, রাওদাতুত তালেবীন (روضة الطالبين), প্রথম প্রকাশ: ১৪২৩ হি., দারু ইবনে হাযম, ১৮০৩; খতীব আশ-শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ (مغني المحتاج) ৬/৬৫।

২০. মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবনিল মুনযির আন-নীসাপূরী, আবূ বকর, আশ-শাফে'য়ী, শাইখুল ইসলাম। তিনি ছিলেন, ইমাম, হাফেয, ফকীহ ও মুজতাহিদ। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ থেকে উল্লেখযোগ্য হলো আল-আওসাত ফিস সুনান (الأوسط في السنن), আল - ইশরাফ ফী ইখতিলাফিল 'ওলামা (الإشراف في اختلاف العلماء) এবং আল-ইজমা' (الإجماع)। তিনি ৩১৮ হিজরীতে মারা যান। - [দ্রষ্টব্য: যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (سير أعلام النبلاء), একাদশ সংস্করণ, মুয়াসসাসাতুর রিসালাত, বৈরুত: ১৪/৪৯০; যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায (تذكرة الحفاظ), দারু এহইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, বৈরুত: ৩/৭৮২; সুয়ূতী, ত্বাবাকাতুল হুফ্ফায (طبقات الحفاظ), সম্পাদনা: 'আলী মুহাম্মদ ওমর, মাকতাবাতু ওয়াহবা, মিশর: ৩২৮]।

২১. ইবনিল মুনযির, আল-ইকনা'উ (الإقناع) প্রথম প্রকাশ: ১৪০৮ হি./ ১৯৮৭ খ্রি., মাতাবে'উল ফিরাযদাক, রিয়াদ, ২/৪৬৪ ... ।

২২. শাফে'য়ী, আল-উম্ম (الأم) ৪/২৪০ ।

২৩. সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৫ ।

২৪. ইবনিল মুনযির, আল-ইকনা'উ (الإقناع) ২/৪৬৪; ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা (المحلّى) ৭/২১৫; আশ-শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ (مغني المحتاج) ৬/৬৫; ইবনু রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ (بداية المجتهد), প্রথম প্রকাশ ১৪২৪ হি., দারু ইবনে হাযম, বৈরুত ১/৩৪২ ।

২৫. বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ (الجامع الصحيح), দারু এহইয়ায়িল কুতুবুল 'আরাবিয়্যা, মুদ্রণ ত্বব'আতু বুলাক ১/১৩ হাদিসের শব্দগুলো বুখারীর; মুসলিম, আস-সহীহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আবদুল বাকী, ১৪০০ হি./১৯৭৯ খ্রি., রিয়াসাতু ইদারাতিল বাহুসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা ওয়াদ দা'ওয়াহ ওয়াল ইরশাদ ১/৩৪২, হাদিস নং- ৩২ ।

২৬. শাফে'য়ী, আল-উম্ম (الأم) ৪/২৩৮; ইবনু রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ (المجتهد بداية) ১/৩৪২ ।

২৭. আল-কাসানী, বাদায়ে'উস সানায়ে' (بدائع الصنائع) ৭/১৬৩; ইবনু রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ (بداية المجتهد) ১/৩৪২; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (المغني) ১৩/১৭৭ ।

২৮. আলী সাদিক (আবূ হাইফ), আল-কানুন আদ-দাউলিউল 'আম (القانون الدولي العام) পৃ. ৮১৬

২৯. 'ঈসা রাবাহ, মওসূ'আতুল কানুন আদ-দাওলি (موسوعة القانون الدولي) ৬/১১৬; মুহাম্মদ ওফিক, মওসূ'আতু হুকুকীল ইনসান (موسوعة حقوق الإنسان) কায়রো, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ ১/২৩৮ ।

৩০. 'ঈসা রাবাহ, মওসূ'আতুল কানুন আদ-দাওলি (موسوعة القانون الدولي) ৬/১১৬; মুহাম্মদ ওফিক, মওসূ'আতু হুকুকীল ইনসান (موسوعة حقوق الإنسان) ১/২৩৮ ।

৩১. আল-'উশমাবী (মহী উদ্দীন), হুকুকুল মাদানিয়্যীনা তাহতাল ইহতিলালিল হারবী (حقوق المدنيّين تحت الاحتلال الحربي), 'আলামুল কুতুব, কায়রো, পৃ. ৩১৮ ।

৩২. আল-কাসানী, বাদায়ে'উস সানায়ে' (بدائع الصنائع) ৭/১৬২; হাশিয়াতু ইবনে 'আবেদীন (حاشية ابن عابدين) ৬/২০৯; ইবনু রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ (بداية المجتهد) ১/৩৪৩; আল-ক্বারাফী, আয-যাখীরা (الذخيرة) ৩/২৩৯; আশ-শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ (مغني المحتاج) ৬/৭১; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (المغني) ১৩/১৪৬; আল-বাহুতী, শরহু মুন্তাহাল ইরাদাত (شرح منتهى الإرادات) ৩/১৭ ।

৩৩. সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯০ ।

৩৪. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম (تفسير القرآن العظيم) ১/৫২৪ ।

৩৫. আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ইবন আবদিল মুত্তালিব ইবন হাশিম ইবন আবদে মানাফ আল-কুরাইশী আল-হাশেমী রা., সাহাবী, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই । তাঁর মাতা হলেন উম্মুল ফদল লুবাবা বিনত হারেস আল-হেলালিয়া । তিনি হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন । তখন বনু হাশিম গিরিগুহায় অবরুদ্ধ ছিল । আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন । তবে প্রথম তথ্যটিই অধিক বিশুদ্ধ । নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দো'আ করেছিলেন, তিনি বলেছেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে দীনের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান দান করো এবং তাকে (আল-কুরআনকে) ব্যাখ্যা করার জ্ঞান দান করো; ফলে তাঁকে 'আরবের পন্ডিত' (حبر العرب), 'উম্মতের পন্ডিত' (حبر الأمة) এবং 'আল-কুরআনের ভাষ্যকার' (ترجمان القرآن) নামে উপাধি দেয়া হয়েছিল । তিনি আবদুল্লাহ ইবন আবি সারাহ রা. - এর সাথে আফ্রিকাতে যুদ্ধ করেছেন । তিনি ৬৯ হিজরীতে তায়েফে মারা যান । কেউ কেউ বলেন, তিনি ৭০ হিজরীতে মারা গেছেন । [দ্রষ্টব্য: ইবনু হাজার, আল-ইসাবা ফী তামযীযিস সাহাবা (الاصابة في تمييز الصحابة), ক্রমিক নং- ৫৪২৩; তাহযীবুত তাহযীব (تهذيب التهذيب) : ৩/১৭০] ।

৩৬. হাসান ইবন আবিল হাসান ইয়াসার ইমাম শাইখুল ইসলাম আবূ সা'য়ীদ আল-বসরী, তাবে'য়ী; তাকে জামিল ইবন কুতাবা'র 'মাওলা' বলা হয়। কেউ কেউ বলেন জাবির ইবন আবদিল্লাহ; আবার কেউ কেউ বলেন আবূল ইয়াসার। তাঁর মাতা হলেন উম্মু সালমার আযাদকৃত দাসী খায়রাহ্। তিনি ওমর রা. এর খিলাফতের দুই বছর বাকি থাকতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মদীনাতে বেড়ে ওঠেন এবং উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর খিলাফত কালে আল-কুরআনের হিফয সম্পন্ন করেন। তিনি ছিলেন প্রখর মেধাবী, সাহসী, জ্ঞানে ও কর্মে তাঁর সমসাময়িক জনগোষ্ঠীর নেতা, বসরাবাসীদের গুরু এবং ফকীহ। তিনি ১১০ হিজরীতে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। [দ্রষ্টব্য: যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (سير أعلام النبلاء) ৪/৫৬৩; তাযকীরাতুল হুফ্ফায (تذكرة الحفاظ) ১/৭২; ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (تهذيب التهذيب), সম্পাদনা: খলিল মামুন শিহা, প্রথম প্রকাশ: ১৪১৭ হি., দারুল মা'য়ারেফত, বৈরুত ১/৫৪১; সুয়ূতী, ত্বাবাকাতুল হুফ্ফায (طبقات الحفاظ) ২৮]।

৩৭. ওমর ইবন আবদিল আযীয ইবন মারওয়ান ইবন হেকাম ইবন আবিল 'আস ইবন উমাইয়া ইবন আবদে শামস আল-কুরাশী আল-উমাভী, আবূ হাফস আল-মাদানী, অতঃপর আদ-দামেস্কী, আমীরুল মুমিনীন। তাঁর মাতা হলেন উম্মু 'আসেম বিনতে 'আসেম ইবন ওমর ইবনিল খাত্তাব রা.। তিনি ছিলেন সংসারত্যাগী ধর্মনিষ্ঠ খলিফা। তিনি ইয়াযিদের রাজত্ব কালে মদীনাতে জন্মগ্রহণ করেন। আর বেড়ে ওঠেন মিসরে, যখন সেখানকার গভর্নর ছিলেন তাঁর পিতা। তিনি ছিলেন ইমাম, ফকীহ, মুজতাহিদ এবং সুন্নাহর জ্ঞানে অভিজ্ঞ ও তার সংরক্ষণকারী। তিনি ১০১ হিজরীর রজব মাসে ৩৯ বছর ৬ মাস বয়সে দাইরে সাম'আন নামক স্থানে মারা যান এবং সেখানেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়। [দ্রষ্টব্য: যাহাবী, তাযকীরাতুল হুফ্ফায (تذكرة الحفاظ) ১/১১৮; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (سير أعلام النبلاء), ৫/১১৪; ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (تهذيب التهذيب) ৪/২৮৬]।

৩৮. জাস্সাস, আহকামুল কুরআন (أحكام القرآن), ১/৩২০; কুরতুবী, আল-জামে'উ লি-আহকামিল কুরআন (الجامع لأحكام القرآن) ২/৩৪৫।

৩৯. সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯০।

৪০. সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৩৬।

৪১. সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৫।

৪২. সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৪।

৪৩. সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৭০।

৪৪. সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৬।

৪৫. সূরা আল-কাফ, আয়াত: ২৯।

৪৬. সূরা আত-তাকভীর, আয়াত: ২৮।

৪৭. সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৯।

৪৮. আবদুল্লাহ ইবন ওমর ইবনিল খাত্তাব ইবন নুফাইল আল-কুরাইশী আল-'আদাভী। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী। তিনি নবুয়তের তৃতীয় বর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে হিজরত করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে অনুসরণের ব্যাপারে খুব বেশি যত্নবান ছিলেন। তিনি ষাট বছর জনগণকে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে ফতোয়া দেন। আর তিনি মিশর জয়ে অংশগ্রহণ করেন। তিনি হিজরী ৭২ অথবা ৭৩ সনে সাতাশি বছর বয়সে মারা যান। [দ্রষ্টব্য: আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা (الإصابة في تمييز الصحابة), ইবনু হাজার, ক্রমিক নং ৫৪৯৫; উসুদুল গাবা (أسد الغابة), ইবনুল আছীর, ক্রমিক নং ৩০৮২; ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (تهذيب التهذيب), ৩/২০১]।

৪৯. বুখারী, আল-জামে' আস-সহীহ, অধ্যায়: জিহাদ ও যুদ্ধ (كتاب الجهاد والسير), পরিচ্ছেদ: যুদ্ধে নারীদেরকে হত্যা করা প্রসঙ্গে (باب قتل النساء في الحرب), মারকাযুদ দিরাসাত ওয়াল ই'লাম, ইশবেলিয়া, রিয়াদ, ৩য় খন্ড, ৮ম ভাগ, ৪/২১।

৫০. বুখারী, আল-জামে' আস-সহীহ, সম্পাদনা: মুস্তাফা আল-বাগা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৭ হি., দারু ইবনে কাছীর, বৈরুত, ৩/১০৯৮, হাদিস নং

২৮৫১; মুসলিম, আস-সহীহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, দারু এহইয়ায়িত তুরাছ, বৈরুত, ৩/১৩৬৪, হাদিস নং ১৭৪৪ ।

৫১. মহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শারফ ইবন মাররী আল-হাযামী, আল-হাওরানী, আন-নববী, আশ-শাফে'য়ী, শাইখুল ইসলাম, হাফেয, ফকীহ ও আদর্শ। তিনি হিজরী ৬৩১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হলো: শরহু সহীহি মুসলিম (شرح صحيح مسلم), রিয়াদুস সালেহীন (رياض الصالحين), আল-আযকার (الأذكار), আল-আরাবাঈন (الأربعين), আল-ইরশাদ (الإرشاد), আত-তাকরীব (التقريب), কিতাবুল মুবহামাত (كتاب المبهمات), রাওদাতুত তালেবীন (روضة الطالبين) ও আল-মাজমূ'উ শরহিল মাযহাব (المجموع شرح المذهب)। তিনি হিজরী ৬৭৬ সনে ইন্তিকাল করেছেন। [দেখুন: যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (تذكرة الحفاظ), পৃ. ১৪৭০; সুয়ূতী, ত্বাবাকাতুল হুফ্ফায (طبقات الحفاظ), পৃ. ৫১০; ইবন কাসীর, আল-বেদায়া ওয়ান নিহায়া (البداية والنهاية) পৃ. ১৩/৩২২]।

৫২. আল-মিনহাজু শরহি সহীহি মুসলিম (المنهاج شرح صحيح مسلم), সম্পাদনা: খলিল মামুন শিহা, দারুল মা'য়ারেফত, ২/২৭৫ ।

৫৩. আস-সান'আনী, সুবুলুস সালাম (سبل السلام), ৭/২৫৪; আল-'আযীম আবাদী, 'আওনুল মা'বুদ (عون المعبود) ৭/১৯৬, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, বৈরুত ।

৫৪. আহমদ, মুসনাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৪ হি., দারু এহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, ২/২১, ২২, ২৩, ৭৬, ১০০, ১১৫; আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায়: জিহাদ (كتاب الجهاد), পরিচ্ছেদ: মুশরিকদের দো'য়া প্রসঙ্গে (باب في دعاء المشركين) এবং নারীদেরকে হত্যা করা প্রসঙ্গে (باب في قتل النساء), সম্পাদনা: মুহাম্মদ মহীউদ্দীন আবদুল হামীদ, দারুল ফিকর, ৩/৫৩, ৩/৩৭; ইবনু মাজাহ: আস-সুনান, অধ্যায়: জিহাদ (كتاب الجهاد), পরিচ্ছেদ: ঘুমন্ত অবস্থায় হামলা প্রসঙ্গে (باب الغارة والبيات) এবং নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা প্রসঙ্গে (باب في قتل النساء والصبيان), সম্পাদনা: খলিল মামুন শিহা, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৬ হি., দারুল মা'য়ারেফত, বৈরুত, ৩/৩৭৯, ৩/৩৮১;

দারেমী, আস-সুনান, অধ্যায়: যুদ্ধ (كتاب السير), পরিচ্ছেদ: নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা থেকে নিষিদ্ধকরণ প্রসঙ্গে (باب النهي عن قتل النساء و الصبيان) ২/৬৭১; মালেক, মুয়াত্তা, অধ্যায়: জিহাদ (كتاب الجهاد), পরিচ্ছেদ: যুদ্ধে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা থেকে নিষিদ্ধকরণ প্রসঙ্গে (باب النهي عن قتل النساء و الولدان في الغزو), সম্পাদনা: বাশার 'আওয়াদ মা'রুফ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৭ হি., দারুল গারবিল ইসলামী, ১/৫৭৫-৫৭৮; ইবনু আবি শায়বা, আল-মুসান্নাফ (المصنف), অধ্যায়: জিহাদ (كتاب الجهاد), পরিচ্ছেদ: যুদ্ধের এলাকায় যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ (باب من ينهى عن قتله في دار الحرب), সম্পাদনা: কামাল আল-হূত, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৯ হি, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, ১২/৩৮১-৩৮৮ ।

৫৫. মালেক, মুয়াত্তা, অধ্যায়: জিহাদ (كتاب الجهاد), পরিচ্ছেদ: যুদ্ধে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা থেকে নিষিদ্ধকরণ প্রসঙ্গে (باب النهي عن قتل النساء و الولدان في الغزو), ২/৪৪৭ ।

৫৬. যারকানী, শরহুহু 'আলা মুয়াত্তা মালেক (شرحه على موطأ مالك), ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খ্রি., দারুল মা'আরেফত, বৈরুত, লেবানন: ৩/১৩ ।

৫৭. না'য়ীম ইবন মাস'উদ ইবন 'আমের ইবন উনাইফ ইবন সা'লাবা আল-আশজা'য়ী, আবূ সালমা, সাহাবী । তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর খিলাফতের প্রথমদিকে উষ্ট্রের যুদ্ধের ঘটনায় শাহাদাত বরণ করেন । আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি 'উসমান ইবন 'আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর খিলাফতকালে মারা যান । [দ্রষ্টব্য: ইবনু হাজার, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা (الإصابة في تمييز الصحابة), ক্রমিক নং ৯১২৬; ইবনুল আছীর, উসুদুল গাবা (أسد الغابة) , ক্রমিক নং ৫২৮১; ইবনু আবদিল বার, আল-ইসতি'আব (الاستيعاب) ক্রমিক নং ২৬৬৫] ।

৫৮. আহমদ, আল-মুসনাদ, মুআসসাসাতু কুরতুবা, কায়রো, ৩/৪৮৭, হাদিস নং ১৬০৩২; আবূ দাউদ, আস-সুনান, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মহীউদ্দীন আবদুল হামীদ, দারুল ফিকর, ৩/৮৩ ।

৫৯. সারাখসী, আল-মাবসূত (المبسوط)১০/৯২; নববী, রাওদাতুত তালেবীন (روضة الطالبين) পৃ. ১৮০৩; ইবন কুদামা, আল-মুগনী (المغني)

১৩/৭৯; ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ (زاد المعاد), ২/১৪০, ১৯৩; ইবনু মুফলিহ, আল-মুবদি'উ (المبدع), ৩/৩৯৩; মুহাম্মদ আশ-শাওকানী, আস-সায়লুল জারার (السيل الجرار) সম্পাদনা: মুহাম্মদ ইবরাহীম, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৫ হি., দারুল কতুবিল 'ইলমিয়্যা, বৈরুত, ৪/৫৬০-৫৬১।

৬০. আল-'ইকদুল ফরীদ (العقد الفريد) ১/১৫১ ও তার পরবর্তী পৃষ্ঠা।

৬১. আল-বাজী আবুল ওয়ালিদ, আল-মুন্তাকা (المنتقى) ৩/১৬৭।

৬২. আবদুর রহমান ইবন 'আমর ইবন ইয়াহমাদ আল-আওযা'য়ী, আবূ ওমর। তিনি 'বা'লাবাক্কু' শহরে ৮৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাম, ইরাক, মক্কা ও মদীনার আলেমগণের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ছিলেন একজন ফকীহ, মুফতী ও ফিকহ বিষয়ক একটি মাদরাসার মালিক (পরিচালক)। তিনি বৈরুতে ১৫৭ হিজরীতে সত্তর বছর বয়সে মারা যান। [দ্রষ্টব্য: শিরাযী, ত্বাবাকাতুল ফুকাহা (طبقات الفقهاء) ৭৫-৭৬; যাহাবী, সিয়ার" আ'লামিন নুবালা (سير أعلام النبلاء), ৭/১০৭-১৩৪; আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম (الأعلام), ৩/৩২০]।

৬৩. মুহাম্মদ ইবন হাসান ইবন ফরকাদ আশ-শায়বানী; তিনি ফকীহ, উসূলবিদ, আবূ হানিফা র. - এর অনুসারীদের মধ্যে অন্যতম এবং তিনি তাঁর জ্ঞানের প্রকাশক ছিলেন। [দ্রষ্টব্য: ইবনুল 'আম্মাদ, শাযরাতুয যাহাব (شذرات الذهب) ১/৩২১-৩২৪; আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম (الأعلام), ৬/৮০]।

৬৪. তকী উদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহমদ ইবন আবদিল হালিম ইবন আবদিস সালাম ইবন আবদিল্লাহ ইবন আবিল কাসেম আল-হাররানী আদ-দামেস্কী, শাইখুল ইসলাম, আল-হাম্বলী। তিনি ছিলেন হাফেয, সমালোচক, ফকীহ, মুজতাহিদ, মুফাসসির ও মুহাদ্দিস। তিনি ৬৬১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ থেকে উল্লেখযোগ্য একটি গন্থ হলো: " الفتاوى " (ফতোয়াসমগ্র); তিনি ৭২৮ হিজরীতে মারা যান। [দ্রষ্টব্য: যাহাবী, তাযকীরাতুল হুফ্ফায (تذكرة الحفاظ) ৪/১৪৯৬-১৪৯৮; ইবনুল 'আম্মাদ, শাযরাতুয যাহাব (شذرات الذهب), সম্পাদনা : আল-আরনাউত, দারু ইবনে কাছীর, দামেস্ক, ৭/১৪২, ১৫০; সুয়ূতী, ত্বাবাকাতুল হুফ্ফায (طبقات الحفاظ) ৫১২।

৬৫. মূল শব্দ " الزَّمِن " যার অর্থ: দুর্ঘটনা বা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, যা নিয়ে সে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। " الزَّمِن " শব্দটি " أَزْمَنَ " শব্দ থেকে গৃহীত; অর্থাৎ " أتى عليه الزّمان " (সময় বা কাল তাকে ধ্বংস করল)। [দ্রষ্টব্য: ফিরোযাবাদী : আল-কামূসুল মুহীত (القاموس المحيط), ১২০৩; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (المغني) ১৩/১৮০]।

৬৬. মাজমু'উল ফাতাওয়া (مجموع الفتاوى) [ফতোয়াসমগ্র] ২৮/৩৫৪-৩৫৫।

৬৭. ইউসূফ ইবন আবদিল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদিল বার আন-নামেরী আল-কুরতুবী আবূ ওমর। মরক্কোর হাফেয, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও ইতিহাসবিদ। তিনি মুজতাহিদের মানে পৌঁছেছিলেন। তিনি ৩৬৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। যাহেরী মতাবলম্বী ছিলেন, অতঃপর মাসায়েলের ক্ষেত্রে ইমাম শাফে'য়ী র. - এর ফিকহের প্রতি তাঁর সুস্পষ্ট ঝোঁক বা আকর্ষণ থাকা সত্বেও তিনি মালেকী মাযহাবের অনুসারীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য হলো: আত-তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ (التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد); আল-ইস্তিযকার লিমাযহাবে 'ওলামায়িল আমসার ফীমা তাদাম্মানাহুল মুয়াত্তা মিন মা'আনির রায় ওয়াল আছার (الاستذكار لمذهب علماء الأمصارفيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي و الآثار); জামে'উ বায়ানিল 'ইলম ওয়া ফাদলিহি (جامع بيان العلم و فضله); আল-ইসতি'য়াব ফী মা'আরেফাতে আসমায়িস সাহাবা (الاستيعاب في معرفة أسماء الصحابة); আল-ফারায়েদ (الفرائض) এবং আল-কাফী ফী মাযহাবিল ইমাম মালেক (الكافي في مذهب الإمام مالك)। তিনি ৪৬৩ হিজরীতে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। [দেখুন, ইবনু বাশকুয়াল, আস-সিলাতু (الصلة), ২/৬৭৭; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (سير أعلام النبلاء), ১৮/১৫৩ এবং তাযকীরাতুল হুফ্ফায (تذكرة الحفاظ), ২/১১২৮; ইবনু খিল্লিকান, ওফইয়াতুল 'আইয়ান ওয়া আনবায়িয যামান (وفيات الأعيان و أنباء الزمان) ৭/৬৬; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (البداية وا النهاية), ১২/৫৬৮]।

৬৮. সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯০।

৬৯. ইবনু আবদিল বার, আল-ইসতিযকার (الاستذكار), সম্পাদনা: সালেম মুহাম্মদ 'আতা ও মুহাম্মদ 'আলী মু'আওওয়াদ্ব, প্রথম মুদ্রণ, ২০০০ খ্রি., দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, বৈরুত ৫/২৪।

৭০. মুহাম্মদ ইবন আবদিল ওয়াহেদ ইবন আবদিল হামীদ ইবন মাস'উদ আল-ইস্কান্দারী। জন্মগতভাবে আস-সাইওয়াসী, প্রখ্যাত হানাফী ইবনু হাম্মাম উদ্দীনের সাথে সম্পর্কিত। তিনি ৭৯০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, মুফাসসীর, ফারায়েযবিদ, হিসাববিজ্ঞানী, ভাষাবিদ, গায়ক বা সঙ্গীত শাস্ত্রবিদ, যুক্তিবাদী, বক্তা ও কাযী। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ফাতহুল কাদীর ফী শরহিল হিদায়া (فتح القدير في شرح الهداية), উসূলুল ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থ আত-তাহরীর (التحرير), আল-মুসায়ারা ফিল 'আকায়েদিল মুনজিয়্যা ফিল আখেরাহ্ (المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة) এবং যাদুল ফকীর মুখতাসারু ফুরু'য়িল হানাফিয়্যা (زاد الفقير مختصر فروع الحنفية)। [দ্রষ্টব্য: ইবনুল 'আম্মাদ, শাযরাতুয যাহাব (شذرات الذهب), ৭/২৮৯; মুহাম্মদ আল-লাখনবী, আল-ফাওয়ায়েদুল বাহিয়্যা ফী তারাজেমুল হানাফীয়্যা (الفوائد البهية في تراجم الحنفية), ১৩২৪ হি., মিশর: ১৮০]।

৭১. ইবনুল হাম্মাম, ফাতহুল কাদীর (فتح القدير), ৫/৪৫২।

৭২. মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন জুযাই আল-কালবী আল-মালেকী। তিনি ফকীহ, হাফেয, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত শিক ও বড় মাসজিদের খতীব ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: কিতাবু অসীলাতিল মুসলিম ফী তাহযীবে সহীহে মুসলিম (كتاب وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم), আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা (القوانين الفقهية), কিতাবু তাকরীবিল উসূল ইলা 'ইলমিল উসূল (كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول), কিতাবুন নূরিল মুবীন ফী কাওয়া'য়িদে 'আকায়েদিদ্দীন (كتاب النور المبين في قواعد عقائد الدين) ইত্যাদি। তিনি ৭৪১ হিজরীতে মারা যান। [দ্রষ্টব্য: ইবনু ফারহূন, আদ-দীবাজুল মুযাহহাব (الديباج المذهّب) দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, বৈরুত ১/২৯৫]।

৭৩. ইবনু জুযাই, আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা (القوانين الفقهية), ৯৮।

৭৪. আল-কাসানী, বাদায়ে'উস সানায়ে' (بدائع الصنائع): ৭/১৬২; ইবনুল হাম্মাম, ফাতহুল কাদীর (فتح القدير) ৫/৪৫২; ইবনু রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ (بداية المجتهد), ১/৩৪৩; ইবনু আবদিল বার, আল-কাফী (الكافي) ১/২০৮; ইবনু আবদিল বার, আত-তামহীদ (التمهيد) ১৬/১৪৫; ইমাম শাফে'য়ী, আল-উম্ম (الأم), ৪/২৩৯; নববী, আল-মিনহাজু শরহু সহীহ মুসলিম (المنهاج شرح صحيح مسلم), ১২/২৭৬; আশ-শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ (مغني المحتاج), ৬/৬৬; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (المغني), ১৩/১৪১; আল-বাহুতী, কাশ্‌শাফুল কানা' (كشاف القناع) ৩/৪৮; ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা (المحلّى) ৭/২১৫; ইবনুল মুনযির, আল-ইকনা'উ (الإقناع) ২/৪৬৪।

৭৫. সারাখসী, আল-মাবসূত (المبسوط) ১০/৯২; শাফে'য়ী, আল-উম্ম (الأم), ৪/২৩৯; আশ-শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ (مغني المحتاج), ৬/৬৬।

৭৬. নিরাপত্তা চুক্তি বা (عقد أمان) মানে হলো, কোনো যোদ্ধার যুদ্ধের সময়ে সে যতদিন সময় ইসলামী শাসনের অধীনে অবস্থান করবে, ততদিন পর্যন্ত তার জীবন, দাস-দাসী ও ধনসম্পদকে দারুল ইসলামের জন্য বৈধ মনে করার বিষয়টি প্রত্যাহার করা। [দ্রষ্টব্য: আন-নাফরাবী (আহমদ ইবন গনীম), আল-ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানী (الفواكه الدواني), ১৪১৫ হি., দারুল ফিকর, বৈরুত, ১/৩৯৯]।

৭৭. সারাখসী, আল-মাবসূত (المبسوط), ১০/৯২; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (المغني): ১৩/৭৯; ইবনুল কায়্যিম: যাদুল মা'আদ (زاد المعاد), ২/১৪০, ১৯৩।

৭৮. মুহাম্মদ সামী জুনাইনাহ, কানুনুল হারব ওয়াল হিয়াদ (قانون الحرب و الحياد), ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ, কায়রো, ২৩৫; ইহসান হিন্দী, মাবাদিউল কানুন আদ-দাউলিয়্যিল 'আম ফিস সিলমে ওয়াল হারব (مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب) ১৯৮৪ খ্রি., দারুল জলীল, দামেস্ক: ২৬১; আবদুল ওয়াহেদ মুহাম্মদ ফার, উসারাল হারব (أسرى الحرب), ১৯৭৫ খ্রি., 'আলামুল কুতুব, কায়রো, ৩৬।

৭৯. ইহসান হিন্দী, মাবাদিউল কানুন আদ-দাউলিয়্যিল 'আম ফিস সিলমে ওয়াল হারব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।

৮০. আবূ হাইফ 'আলী সাদিক, আল-কানুন আদ-দাউলিয়্যূল 'আম (القانون الدولي العام), দ্বাদশ সংস্করণ, মানশাআতুল মা'আরেফ, আলেকজান্দ্রিয়া ৭৯১।

৮১. ইহসান হিন্দী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।

৮২. রাবাহ 'ঈসা, প্রাগুক্ত, ৬/১৭১।

৮৩. প্রাগুক্ত, ১/৫২।

৮৪. আল-'উশমাবী (মহীউদ্দীন), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩; ইহসান হিন্দী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৮৫. রাবাহ 'ঈসা, প্রাগুক্ত, ৬/৩৮২।

৮৬. ওফিক মুহাম্মদ, মওসূ'আতু হুকুকিল ইনসান ১/১৭।

৮৭. আল-'উশমাবী, মহীউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮।